যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক

শিবদাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক
—শিবদাস ঘোষ

পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯
৫ম মুদ্রণ ঃ ১০ অক্টোবর, ২০১২
৬ষ্ঠ মুদ্রণ ঃ ১০ জুন, ২০১৬
সপ্তম মুদ্রণ ঃ ৫ অক্টোবর, ২০১৮
অষ্টম মুদ্রণ ঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ১৮২৮, (০৩৩) ২২৬৫ ৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ২০ টাকা

প্রকাশকের কথা

১৯৬৯ সালের ৩০ জুলাই কলকাতায় অনুষ্ঠিত দলের একটি স্টাডি ক্লাসে দলীয় কর্মীদের দ্বারা উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই আলোচনাটির অবতারণা করেন। তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার এক প্রধান শরিক সিপিআই(এম) নিজ দলীয় সংগঠন ও প্রভাবাধীন এলাকা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারি ক্ষমতা ও পুলিশকে কাজে লাগিয়ে অপরাপর দল এমনকী ফ্রন্টে আমাদের দল সহ অন্যান্য শরিকদের সংগঠন ধ্বংস করা শুরু করেছিল। গ্রামীণ পশ্চিমবাংলায় বারবার সংঘর্ষ, রক্তপাত ও হত্যা সংঘটিত হচ্ছিল; ফ্রন্টের সংহতি এতে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের আর ফ্রন্টে থাকা উচিত কিনা সে সম্পর্কে জনসাধারণের একাংশ, এমনকী আমাদের কিছু কর্মীর মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির বিচার করে, কমরেড ঘোষ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐ বিশেষ পর্যায়ে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে যুক্তফ্রন্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে ও কেন সিপিআই(এম)-এর চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক নীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার সাথে সাথেই বিপ্লবী দলকে ফ্রন্টের ঐক্যকে চোখের মণির মত রক্ষা করতে হবে — এই বিষয়গুলি এবং একই সাথে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া দল ও তার গণসংগঠনগুলোর কার্যাবলী পরিচালনার নানান দিক সম্পর্কেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তিনি পার্টি কর্মীদের কাছে তুলে ধরেছেন।

আলোচনাটি প্রকাশনার উপযুক্ত করে সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোন অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি থাকলে তার দায়িত্ব সর্বাংশেই আমাদের। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে বইটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে বইটির অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হল।

৪৮, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক

আজকের এই স্টাডি ক্লাসে আমার কাছে অনুরোধ এসেছে আমি যেন বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের ভিতরকার পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তার পটভূমিতে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের ভিতরে ও বাইরে আমাদের কাজের পদ্ধতি কী হওয়া উচিত তা নিয়েও কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। এর বাইরেও প্রতিদিনকার সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনা সংক্রান্ত কিছু কিছু প্রশ্ন এসেছে। আমি আমার আলোচনায় প্রথমে যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ত আমার বক্তব্য আপনাদের সামনে রাখব। তারপর সাংগঠনিক বিষয়ের ওপর কিছু আলোচনা করব।

যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

যুক্তফ্রন্ট এবং যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে আমাদের ভূমিকা কী হবে এ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হলে কমরেডদের একটা মূল বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি এবং সেই অর্থে যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনার প্রশ্নে বিভিন্ন পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলোর যে উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, একটি প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকে মৌলিকভাবেই আলাদা। একটি যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা বিশেষ স্তরে যুক্তফ্রন্টকে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার বলে মনে করে। অন্যদিকে সমস্ত প্রকারের পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলোর কাছে যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে একটা 'প্রিভিলেজ', একটা সুবিধা, নিজেদের সংকীর্ণ পার্লামেন্টারি স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার একটা উপায় মাত্র। এর দ্বারাই আপনারা বুঝতে পারবেন, কেন একটা সর্বসম্মতভাবে

গৃহীত সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে একই প্ল্যাটফর্মে থেকে লড়াই পরিচালনা করার সময়েও মূল নীতির প্রশ্নে একটি বিপ্লবী দলকে প্রায় প্রতিটি বিষয়ে নিরন্তর অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া দলগুলির সাথে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়।

আপনারা জানেন, স্বাভাবিক শ্রেণীস্বার্থবোধ থেকেই বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি, তার পৃষ্ঠপোষক প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠী — জোতদার থেকে শুরু করে মালিকশ্রেণী — সব আমাদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন, সি পি আই (এম) থেকে শুরু করে নকশালপন্থী বন্ধুরা বিভিন্ন ইস্যুতে কখনও আমাদের সমর্থন করে, কখনও বিরোধিতা করে। যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে যে সমস্ত দল রয়েছে তারাও কখনও আমাদের সমর্থন করে, কখনও বিরোধিতা করে। বেশিরভাগ সময়েই তারা আমাদের বিরোধিতা করে, কখনও কখনও কোন একটা ইস্যুতে কোন সময়ে হয়তো তাদের কারোর সঙ্গে আমাদের মিল হয়। যেমন, কখনও দেখা যায়, কোন একটি বিশেষ ইস্যুতে হয়তো আমাদের সাথে সি পি আই (এম)-এর মিল হচ্ছে, অপরের সঙ্গে বিরোধিতা হচ্ছে। আবার কখনও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে, বা ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে না হয় সি পি আই-এর সঙ্গে নাহয় আর এস পি-এর সঙ্গে একটা ব্যাপারে মিল হচ্ছে, বাকি অন্য সকলের সাথে বিরোধ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সাথে অন্য সকলের বিরোধটাই হচ্ছে প্রধান এবং এই বিরোধে যুক্তফ্রন্টের ভিতরে সমস্ত পার্টিগুলিই আমাদের বিরুদ্ধে এক।

একথা ঠিক, যুক্তফ্রন্টে যে সমস্ত দল রয়েছে তাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের বিরোধ আছে। কিন্তু আমাদের রোখবার প্রয়োজনে, বিপ্লবকে রোখবার প্রয়োজনে এদের প্রত্যেকেরই আমাদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ শ্রেণীস্বার্থবোধ কাজ করে। তাই দেখা যায়, আমরা একটা ছোট পার্টি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধে তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধ। বিশাল ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে, অনেক পার্টির তুলনায় আমরা ছোট। কিন্তু তবু আমাদের বিরুদ্ধে যখন বিরোধিতার প্রশ্ন আসে তখন দেখা যায় এদের প্রত্যেকের মধ্যে যেন একটা জিদ কাজ করে, প্রচুর উৎসাহ কাজ করে। আসলে এটা হ'ল একটা শ্রেণীবিরোধিতা। কাজেই শুধুমাত্র কংগ্রেস এবং পুঁজিপতি ও জোতদারশ্রেণীর সঙ্গেই আমাদের বিরোধ নয় — আদর্শগত ক্ষেত্রে সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে আমাদের বিরোধ, সি পি আই-এর সঙ্গে আমাদের বিরোধ বা বাংলা কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলগুলির সাথে আমাদের বিরোধ এক ধরনের শ্রেণীসংগ্রামকেই প্রকাশ করছে। অথচ বাস্তবে সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী যে নানা শ্রেণী সমাজে অবস্থান করে তাদের মধ্যে যে শ্রেণীটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল — যার বিরুদ্ধে অন্যদের আলাদা করে আমরা আজ শ্রেণীসংগ্রামটা করতে যাচ্ছি — সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধে

সংগ্রামে অন্যান্য শক্তিগুলোর সঙ্গে বিপ্লবীদের একটা সমঝোতা গড়ে তোলার সংগ্রামও চলছে। যতক্ষণ জনগণের বিপ্লবী চেতনা গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে এই শক্তিগুলো জনগণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শক্তিগুলোর সঙ্গে সমঝোতার এই প্রক্রিয়াটি চলবে, অন্তত তা রক্ষা করবার চেষ্টা বিপ্লবের প্রয়োজনেই আমাদের করতে হবে।

একটা কথা আমি আগেই বলেছিলাম যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের উপর আক্রমণ আসছে এবং তার জন্য আপনাদের আমি তৈরি হতেও বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, এবারের যুক্তফ্রন্টে আমাদের চলা খুব সহজ হবে না। গতবার যুক্তফ্রন্টের আমলে আমাদের চারজন কমরেড খুন হয়েছেন। এবার ইতিমধ্যেই আমাদের চারজন কমরেড খুন হয়েছেন, আরও চারজন কমরেড মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছেন, পঞ্চাশজনের মতো গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। এর বেশিরভাগই ঘটেছে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত অপর পার্টির মদতপুষ্ট জোতদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে। অন্যান্য পার্টিগুলো নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুলিশকে পিছনে রেখে জোতদারদের সাহায্য করার ফলেই এসব ঘটছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও একটা কথা এখানে খুব ভাল করে আপনাদের মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, এর জন্য যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে লালনপালন করা কোনমতেই উচিত হবে না। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন।

প্রতিক্রিয়াশীল দল ও শক্তিগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার মত ক্ষমতা যেখানে বর্তমানে শুধু বিপ্লবী দল নয়, এককভাবে কোন বিরোধী দলেরই নেই, সেখানে সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলির যুক্তফ্রন্টই হচ্ছে একমাত্র বিকল্প। অন্যদিক থেকে বলা চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরটি যতদিন ধরে চলবে অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত না জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো পরিচালনা করতে করতে সত্যিকারের একটি বিপ্লবী দল এবং তার গণসংগঠনগুলি এমন ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে, যার দ্বারা সেই পার্টিটি একক শক্তিতেই সমস্ত গণআন্দোলনগুলিকে কো-অর্ডিনেট করে ও নেতৃত্ব দিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম ততদিন যুক্তফ্রন্ট একটা সাময়িক সুবিধা মাত্র নয়, যুক্তফ্রন্ট গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য — যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির ভিত্তি

অন্যদিক থেকেও যুক্তফ্রন্টের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা কী সেটা আপনাদের ভাল করে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। বস্তুত বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া দলগুলি

জনসাধারণের ওপর আদর্শগত ও সংগঠনগতভাবে আজও যে প্রভাব বিস্তার করে আছে তার থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্যও যুক্তফ্রন্ট ঐতিহাসিক ও বাস্তব প্রয়োজন। কারণ জনসাধারণের যে অংশ আজও নানা পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল সম্পর্কে মোহগ্রস্ত এবং তাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে যুক্তফ্রন্ট তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের মধ্যে সামিল ও সংগঠিত করার ফলে একদিকে যেমন আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং তার দ্বারা আন্দোলন শক্তিশালী হয়, সাথে সাথে যে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে এসে জড়ো হয় তারা বিপ্লবী রাজনীতি ও আদর্শ সম্পর্কে আরও বেশি করে পরিচিত হওয়ার ও তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিপ্লবী দলের নেতাদের এমনকী সাধারণ কর্মীদেরও উন্নত চরিত্রগত সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান যা তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয় তার সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসাটাও জনসাধারণকে বিপ্লবী রাজনীতি ও আদর্শ চিনে নিতে প্রভূতভাবে সাহায্য করে। আপনারা মনে রাখবেন, সমাজের মধ্যে নানা ধরনের যেসব প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ভাবনাধারণা রয়েছে তার ক্ষতিকারক প্রভাবই বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের সামনে প্রবল বাধা হিসাবে কাজ করে। এই বিষাক্ত বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার এবং সাম্যবাদের মহান আদর্শের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার এইটাই একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ। এ কারণেই সমস্ত বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া দলগুলির কাছে যুক্তফ্রন্ট যেখানে কেবলমাত্র একটা সুবিধা, সেখানে একটি যথার্থ বিপ্লবী দলের কাছে বিপ্লবের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে যুক্তফ্রন্ট একটি অপরিহার্য ও অমোঘ হাতিয়ার।

এই কারণেই একটি বিপ্লবী দল যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করার ওপর এত বেশি গুরুত্ব দেয়, যদিও একইসঙ্গে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দলের অবিপ্লবী রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রামও সে পরিচালনা করে। একদিকে সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচি ও আচরণবিধির ভিত্তিতে সাধারণ ও মূল শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, অন্যদিকে এই ঐক্যের মধ্যেই আদর্শগত প্রশ্নে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে — যা আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ ও তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার মধ্যেও প্রতিদিন প্রতিফলিত হচ্ছে, তাকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত পরস্পর আপসহীন আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা এবং এই প্রক্রিয়ায় যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে ক্রমাগত সুদৃঢ় করে চলা — একেই ‘ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যে’র নীতি বলা হয়। এটাই যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির মূল বিপ্লবী নীতি। ফলে যতক্ষণ না ব্যাপক গণচেতনায় অন্যান্য দলগুলো জনগণ থেকে

পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ততক্ষণ যুক্তফ্রন্ট হাতিয়ারটি আমাদের দরকার। গণচেতনায় এই দলগুলির বিরুদ্ধে এখানে সেখানে কিছু বিক্ষুব্ধ আলোচনা এটা প্রমাণ করে না যে, এই দলগুলি 'এগ্‌জস্টেড' (দলগুলির ভূমিকা নিঃশেষিত) হয়ে গেছে। একথা আমি নানা আলোচনায় আগেও বলেছি। অথচ এ সম্পর্কে কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে এখনও খানিকটা বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। তারা মনে করে, এই দলগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের আর কোন মোহ নেই, জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে প্রবল বিক্ষুব্ধ এবং আমাদের এখনই যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধতা করা উচিত। এটা ঠিক করতে হলে প্রত্যেকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গুরুতর আলোচনার ওপরই তা করতে হবে এবং বাস্তব ঘটনা দিয়ে এটা প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যে, বর্তমান অবস্থায় আমরা যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধতা করলে শুধুমাত্র কিছু হতাশাগ্রস্ত যুবক আর কিছু লোকের বাইরে থেকে তারিফ নয়, বাস্তবেই ব্যাপক জনসাধারণ আমাদের সমর্থন করতে থাকবে। তারপরই কেবলমাত্র আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, যুক্তফ্রন্ট আর জনগণের হাতিয়ার নেই, যুক্তফ্রন্ট জনগণের ঘৃণা কুড়োচ্ছে। অথচ বাস্তব ঘটনা তা নয়।

ফলে এখনই আমাদের যুক্তফ্রন্ট ছাড়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। অথচ যুক্তফ্রন্টের মধ্যে থেকে আমাদের এই মারটা খেতে হবে যতটা কংগ্রেস আমলেও আমরা খাইনি। কারণ কংগ্রেস যখন পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করত তখন সমস্ত বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে তার নিন্দা করত। কংগ্রেসের পক্ষে এটা একটা অসুবিধা ছিল। আর সি পি আই(এম) যখন পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করে তখন তাদের সেই অসুবিধা নেই। বরং তাদের ক্ষেত্রে সেটা প্রিভিলেজ (সুবিধা) । এই পার্থক্যটা ভাল করে বুঝতে হবে। কংগ্রেসের আমলে পুলিশি অত্যাচার হলে যারা সেদিন বিরোধী দল ছিল এবং যারা বর্তমানে পশ্চিমবাংলার সরকারি ক্ষমতায় আসীন, যারা সেদিন জনগণের 'কনফিডেন্স এনজয়' (আস্থা অর্জন) করত তারা একত্রে তারস্বরে চিৎকার করত। পুলিশ তখন একটা গুলি চালালে সমস্ত বিরোধী দল ও শক্তি এবং ব্যাপক জনসাধারণ গুলিচালনার প্রতিবাদে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াত। অন্যদিকে আজকের যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবস্থা তা নয়। এই সরকার জনগণের মধ্যে জনগণের সরকার হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। তাই দেখা যায়, আজ এ ধরনের পুলিশি অত্যাচারের ঘটনায় জনগণের মধ্যে একদল যেমন সমালোচনা করে, আবার একদল লোক এই সরকারের সমর্থনে যুক্তি খুঁজতে যায়। তারা মনে করে, পুলিশের অত্যাচারের পিছনে নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে। তারা বিভ্রান্ত হয়ে বলতে থাকে, এরকম হলে কী করে চলবে। এইসব যদি চলতে থাকে যুক্তফ্রন্ট নষ্ট হয়ে যাবে।

এইরকমভাবে তারা আলোচনা করতে থাকে। এর দ্বারা একটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের আমলে কংগ্রেস পুলিশকে ব্যবহার করলে ঠিক যে ধরনের বিক্ষোভ হত, সি পি আই (এম) পুলিশকে ব্যবহার করলে কিছু কিছু লোকের মধ্যে বিক্ষোভ হলেও ব্যাপক জনতার মধ্যে সেই বিক্ষোভের আকারটি তা নয়। তাই জনসাধারণের মধ্যে বিরুদ্ধতা দেখলেই তাকে যেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মতো একই পর্যায়ে আমরা না ফেলি। জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে অনেকটা 'প্যাসিভ' (যথেষ্ট জোরালো নয়)। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে মারাত্মক বিরোধী ভাব (অপোজিশন) ছিল, সি পি আই (এম) সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা আজও সে পর্যায়ে যায়নি। অন্যদিকে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধেও একটা ঐক্যবদ্ধ 'অপোজিশন' নেই। একমাত্র আমরাই বিরুদ্ধে, আর কেউ মিলিতভাবে অপোজিশন দেয় না।

আপনারা মনে রাখবেন, জনসাধারণের এই প্যাসিভ দৃষ্টিভঙ্গি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক। বাস্তবে অবস্থা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, তা আপনাদের গভীরভাবে লক্ষ্য করার প্রয়োজন আছে। যেমন ধরুন, যদি আমরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের কিছু কিছু জনবিরোধী নীতির সমালোচনা করি এবং কংগ্রেস তার সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ থেকে তাকে সমর্থন করে তাহলে তৎক্ষণাৎ তথাকথিত মার্কসবাদী এবং বামপন্থী দলগুলি এমন চিৎকার করতে শুরু করে যেন আমরা যুক্তফ্রন্টেরই বিরোধিতা করছি। ফলে আমরা যখন সি পি আই (এম)-এর সমালোচনা করি, তখন আমাদের সেই সমালোচনার সপক্ষে কংগ্রেসের সমর্থন আমাদের সুবিধা দেয় না। বরং যে অল্পসংখ্যক মানুষ শুধু আমরা বিরোধিতা করলে আমাদের পক্ষে থাকে, কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে একসাথে বিরোধিতা করলে তাও বিপক্ষে চলে যাবে। বলবে, কংগ্রেস যখন বিরুদ্ধতা করছে তখন নিশ্চয়ই সি পি আই (এম)-এর বক্তব্যের কিছু যুক্তিযুক্ততা আছে। কারণ, কংগ্রেস প্রতিক্রিয়াশীল। এইসব সস্তা জিনিস চলছে এবং চলবে। চলছে কেন? কারণ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে যে জনসাধারণ তারাও বড় সহজে যুক্তি এড়িয়ে যায়। যে মানুষগুলোকে নিয়ে বিপ্লব হবে সেই মানুষগুলোর এতটুকু বিপ্লবী চেতনা থাকলে এত সস্তা জিনিস দেশে চলত না। এত সহজে সি পি আই (এম) পার পেয়ে যেত না। তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু এসব জিনিস খুব সহজে চলছে, মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। ফলে সবসময়ই সতর্ক থাকতে হয় যাতে আমাদের কোন ভাল কাজ আবার কংগ্রেস সমর্থন করে না বসে। এইরকম একটা স্তরে আজও আমরা বাস করছি। এইটাই জনসাধারণের চেতনার স্তর। এটা খুব কঠিন অবস্থা। অথচ এই কঠিন অবস্থার মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা গণআন্দোলন ছাড়তে পারব না। শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ঘটানোও আমরা ছাড়তে পারব না।

আবার এটাও বুঝতে হবে যে, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আমাদের দল আছে, তারও একটা সুবিধা আছে। অন্তত চেষ্টা করলে পুলিশি অত্যাচারের বাড়াবাড়িটা যুক্তফ্রন্টে থাকার মধ্য দিয়ে আমরা খানিকটা কমাতে পারি। আমরা যেহেতু সরকারে আছি, পুলিশ বাড়াবাড়ি করলে ভিতর থেকে রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে খানিকটা তার ওপর 'রেস্ট্রেইনিং এফেক্ট' (খানিকটা কমিয়ে আনা) আনতে পারি, অন্তত আনবার চেষ্টা করতে পারি। যদিও আমরা জানি যে, সুযোগ পেলে সকলে মিলেই ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে আমাদের ওপর চাপ দেবে। তবুও এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমরা মন্ত্রীত্বে আছি বলে, যুক্তফ্রন্টে আছি বলে যতটুকু ক্ষুদ্র হোক্ কিছুটা 'রেস্ট্রেইনিং পাওয়ার' (সংযত করার ক্ষমতা) ব্যবহার করতে পারি। এই ক্ষুদ্রটুকুও গণআন্দোলনের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। কারণ এটুকুও খুব জরুরি। একদিকে কংগ্রেস-জোতদার-মালিকশ্রেণী, আর একদিকে সমস্ত বামপন্থী দল — এসব যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায়ও, সে জায়গায় যুক্তফ্রন্টে থাকার দ্বারা যদি আমরা খানিকটা চাপ সৃষ্টি করে — অত্যাচার পুরোপুরি হয়তো বন্ধ করতে পারব না, কিন্তু বাড়াবাড়ি খানিকটা বন্ধ করতে পারি, তাহলে সেই সুযোগটুকু ব্যবহার করে আমরা লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাব।

আবার সাথে সাথে একথাও আপনাদের বুঝতে হবে এবং জনগণকেও বোঝাতে হবে যে, আমরা যে লড়াই চালাচ্ছি সেটা সি পি আই (এম)-এর কায়দায় বিপ্লবী বুক্‌নির আড়ালে পার্লামেন্টারি পার্টির দল বাড়ানো নয় যে, পুলিশ 'প্রোটেকশানে' আমাদের সংগঠন বাড়াতে হবে। আমরা যখন আন্দোলনের ময়দানে লড়বার জন্য মানুষগুলোকে তৈরি করব তখন আমাদের কর্মীদের মানুষকে বোঝাতে হবে যে, যুক্তফ্রন্টের ভিতরে থেকে গভর্নমেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করে পুলিশকে কন্‌ট্রোল করবার, বাড়াবাড়ি না করবার এবং পুলিশ যাতে ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে হস্তক্ষেপ না করে তার জন্য আমাদের যে চেষ্টা সেটা হচ্ছে আন্দোলনের একটা দিক। এটা হচ্ছে 'পার্লামেন্টারি ফোরাম'কে 'এক্‌স্ট্রা পার্লামেন্টারি' কাজে ব্যবহার করবার প্রক্রিয়া। কিন্তু যে সমস্ত কর্মীরা বাইরে এক্‌স্ট্রা পার্লামেন্টারি ফিল্ড-এ মানুষের আন্দোলনগুলোকে তৈরি করার জন্য লড়ছে তাদের মানসিক প্রস্তুতি এবং ভাবনা থাকবে যে, আন্দোলন সংক্রান্ত প্রচারের সময়, একই সঙ্গে জনসাধারণের যুক্তফ্রন্টমুখী মানসিকতাকে পেছনে টেনে এনে জোতদারদের তারা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে ওপর থেকে পুলিশের আক্রমণকে যতটা পারা যায় রেস্‌ট্রেইন করার চেষ্টা করলেও জনসাধারণকে বোঝাতে হবে, পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়েই গণআন্দোলন এবং বিপ্লবের জয়যাত্রার পথে তাদের এগুতে হবে। তাদের বলতে হবে, পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগ্রাম আবার কীসের সংগ্রাম? তেমন ধরনের সংগ্রামের দ্বারা করে-খাওয়া চলতে

পারে, দল বাড়তে পারে, কিন্তু বিপ্লব হবে না। বিপ্লবীদের সংগ্রামে পুলিশের বিরোধিতা হবেই। বিপ্লবী হওয়ার জন্যই তারা পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতা পাবে না। বড়জোর কী হতে পারে? যদি আন্দোলনের প্রভাব সৃষ্টি করা যায়, যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে খানিকটা চাপ সৃষ্টি করতে পারা যায়, জনমতকে প্রচারের দ্বারা খানিকটা বোঝানো যায় তাহলে পুলিশের অত্যাচারটা কমানো যায়, কোথাও কোথাও দু'একটা ঘটনায় তাকে রেস্‌ট্রেইন করেও রাখা যায়। কিন্তু পুলিশ কিছু করবে না তবে আমরা লড়াই করব — এ লড়াই সি পি আই (এম)-এর বীরেরা লড়ছে, আমরা লড়ছি না।

আমরা যদি এই লড়াইটা এভাবে ভাবি, তাহলে বুঝতে হবে, এ নকল লড়াই। এ লড়াই দেখতে বাইরে থেকে বীরের মতন কিন্তু আসলে এ 'কাওয়ার্ডে'র (কাপুরুষের) লড়াই। এ লড়াই পার্লামেন্টারি পার্টির লড়াই। এ লড়াই কোনদিন বিপ্লবী সংহতি, বিপ্লবী চেতনা, বিপ্লবী সংগঠন, বিপ্লবী লড়াইয়ের 'স্ট্র্যাটেজি' (রণনীতি) 'ট্যাক্‌টিকস্‌' (রণকৌশল) কিছুই শেখাবে না। তাই সংঘর্ষ আমরা এড়াতে চাই তা নয়, আমরা এড়াতে চাই 'অ্যাডভেঞ্চার' (হঠকারিতা)। এইটা এড়াবার উপায় হচ্ছে কর্মীদের অধিক রাজনৈতিক চেতনা, প্ল্যান এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ। একেবারে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত একটা সৈনিকের মতন, এক মানুষের মতন প্ল্যান এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ, যাতে যার যেমন মনে হ'ল সে তেমন আচরণ করে ফেলল — এরকম জিনিস না হয়। একেবারে চরম আবেগময় মুহূর্তেও, উত্তেজনার মুহূর্তেও কী করতে হবে তা নেতৃত্বের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে হবে এবং নেতৃত্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

দেখুন, আমাদের রাজনীতি এবং নকশালপন্থী রাজনীতি এক নয়। এবারে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে যে ক'টা আন্দোলন আমাদের দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে সেগুলিকে আমরা বিপ্লবও মনে করি না, মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করাও মনে করি না। আমাদের লড়াইগুলো ছিল মুখ্যত সাময়িক ইস্যুর ভিত্তিতে জোতদারদের বিরুদ্ধে চাষী এবং খেতমজুরদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলোতে কোথাও আমরা নিজেরা মারমুখী হয়ে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাইনি; দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ভরতগড়, ভলেয়া, মধুসূদনপুর — যে তিন জায়গার ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রে এত হৈ চৈ হয়েছে তার একটি ঘটনায়ও নয়। বাস্তবে প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটেছে পুলিশের প্ররোচনায়। অর্থাৎ এই তিনটি ক্ষেত্রেই পুলিশের যোগসাজসটি কোথাও আর এস পি-র সঙ্গে, কোথাও সি পি আই (এম) -এর সঙ্গে, কোথাও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ এবং জোতদার আমাদের বিপক্ষে।

যেমন, ভলেয়ার ঘটনার কথাই ধরুন। ক্যানিং থানার ভলেয়া গ্রামে সাংগঠনিক

দিক থেকে আমাদের দলের প্রভাব রয়েছে। সি পি আই (এম)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ক্যানিং থেকে আমাদের সংগঠনকে উৎখাত করা। কারণ গত বিধানসভা নির্বাচনে ক্যানিংয়ে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি কতটা তা তারা টের পেয়েছে। যদি পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্টের পক্ষে বিপুল হাওয়া না থাকত তাহলে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়েও আমরা আমাদের দলের প্রার্থীকে জিতিয়ে আনতে পারতাম। ভোটের কয়েকদিন আগেও সেখানে অবস্থা আমাদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু শেষমুহূর্তে যুক্তফ্রন্টের প্রবল জোয়ারে তা ভেসে যায়। কিন্তু এত প্রবল জোয়ারের মধ্যেও আমাদের প্রার্থী সেখানে খুব ভাল সংখ্যক ভোট পায়। ফলে সেখানে যেসব এলাকায় নতুনভাবে আমাদের সংগঠন গড়ে উঠেছে, সি পি আই (এম)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখান থেকে আমাদের উৎখাত করা। পুরনো যেসব এলাকায় আমাদের সংগঠন আছে সে তো আছেই, কিন্তু একটা নতুন এলাকায় আমাদের সংগঠন গড়ে ওঠাকে তারা মনে করছে তাদের এলাকা দখল করে নেওয়া। ফলে তারা তা কিছুতেই করতে দেবে না। তাই তারা বাইরে থেকে সমাজবিরোধীদের জড়ো করে এবং পুলিশকে পেছনে রেখে আমাদের সংগঠনের ওপর হামলা করতে থাকে। পুলিশকে তারা তাদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে সেখানে এমন নগ্নভাবে ব্যবহার করেছিল যে, সাধারণত যে জোতদাররা বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে থাকে তারাও ভয়ে সেখানে সি পি আই (এম) করেছিল।

কারণ, এই জোতদারদের রীতি হল আজ একটা দলকে ধরবে, কাল যদি দেখে অন্য কোন দলের প্রোটেকশান দেবার ক্ষমতা বেশি সেখানে চলে যাবে। তারা শুধু প্রোটেকশানের খোঁজে আসে। তারা দল করার জন্য আসে না। কাল আবার যদি কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসে, তাহলে যে সি পি আই (এম)-এর ঝান্ডা আজ তারা তুলছে সেই ঝান্ডা পায়ে মাড়িয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তারা কংগ্রেসের পক্ষে চলে যাবে। এইসব হচ্ছে জোতদার। শ্রেণী অর্থে এদের চরিত্রই এই। তা এইরকম অবস্থায় সিপিআই(এম) ভলেয়া গ্রামে গিয়ে আমাদের সংগঠনের চাষীদের এস ইউ সি আই ছেড়ে সি পি আই (এম)-এর মেম্বার হওয়ার জন্য ভয় দেখাতে থাকে। তারা বলতে থাকে তাদের দলের কৃষক সমিতির মেম্বার হতে হবে। নাহলে এইসব গ্রামে তাদের তারা থাকতে দেবে না। এবং যে সমস্ত বেনাম ও বেআইনি জমি সেখানে আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বে চাষীরা আন্দোলন করে দখল করেছিল এবং চাষ করছিল সেইসব জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করবার জন্য একদিকে সেই সমস্ত জমির মালিককে সিপিআই(এম) চাপ দিতে থাকে, আর একদিকে সেই জমিগুলিকে গায়ের জোরে দখল করার চেষ্টা করতে থাকে। এই নিয়ে সেখানে গণ্ডগোল শুরু হয়। অথচ আপনারা দেখেছেন, প্রেস সেগুলোকে কতরকমভাবে 'ট্যুইস্ট' (বিকৃত) করেছে। কাদের কথায় করেছে? হয় সিপিআই(এম)-এর কথায়

করেছে, নাহয় অন্যত্র বাংলা কংগ্রেসের স্বার্থে করেছে, নাহয় আর এস পি'র স্বার্থে করেছে। কোনও একটি ক্ষেত্রেও আমরা নিজেরা অ্যাডভেঞ্চার করে আক্রমণ করতে যাইনি। কোনও একটি ক্ষেত্রেও পুলিশ আমাদের সহায়তায় নেই। কোনও একটি ক্ষেত্রেও জোতদারদের সঙ্গে মিলজুল করে অপর পার্টির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নেই। ঘটনা এমনও নয় যে, প্রশাসনও আমাদের পক্ষে আছে, পুলিশও আমাদের পিছনে আছে এবং এরই সাহায্যে মারধর করে আমরা আমাদের সংগঠন কিছু বাড়িয়ে নেব। সমাজবিরোধীদের দলে টেনে এনে অন্যদের ভয় দেখিয়ে দল বাড়িয়ে নেওয়া বা জোতদারদের দলে টেনে নিয়ে দল বাড়িয়ে নেওয়া — এরকমভাবে দল আমরা বাড়াতে চাইনি। কারণ জোতদারদের দিয়ে দল বাড়ালে সে দলটা আমাদের থাকবে না। কারণ তারা তো আদর্শের জন্য আসবে না। আর যে আদর্শের জন্য আসে সে একটা ব্যক্তিগত 'সলিটারি' ব্যাপার, ব্যক্তি হিসাবে আসে কোথাও কোথাও। যেমন এঙ্গেলস ব্যক্তিগতভাবে এসেছেন। যিনি ব্যক্তি হিসাবে আসেন তিনি তো বিপ্লবী হয়েই আসেন। তখন তিনি আর জোতদার থাকেন না, জোতদার বলে বিবেচিত হন না। তিনি তখন আর কতকগুলো জোতদারের বিরুদ্ধে চাষী আন্দোলনকেই নেতৃত্ব দেন। তিনি আর তখন জোতদারগোষ্ঠীর লোক থাকেন না। যাই হোক, সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

তা এই হচ্ছে পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওৎ পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে। এ কথাটা ক্ষমতাসীন সি পি আই (এম) নেতারা বুঝছেন না। তাঁরা কমিউনিজমের আদর্শ, মূল তত্ত্ব বাদ দিয়ে প্রায় কংগ্রেসেরই মতন বড় বড় বুক্‌নি আর মিষ্টি কথার চালাকিতে জনতাকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। এইভাবে কমিউনিজমের সুনামকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে কালিমালিপ্ত করছেন। কিন্তু এ করে কিছুদিন চলবে। দু'দিন বাদেই মানুষ বুঝতে পারবে এ এক নতুন ধরনের ভাঁওতা। এ মিষ্টি জুতো। এ মিষ্টি জুতো চলছে। এই রাজনীতির প্রভাব তারা বিস্তার করতে চাইছে। আর কী? হীন পার্টি স্বার্থে তারা পুলিশকে ব্যবহার করছে। পুলিশ কর্তারাও ভাবছে, সি পি আই (এম)-ই তো বড় পার্টি; এখন যদি সি পি আই (এম)-কে তারা তুষ্ট রাখে তাহলে তাদের বিপদ থাকবে না। ফলে সি পি আই (এম)-এর সংগঠন কোথাও থাকুক, না থাকুক, ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্ তারা সি পি আই (এম)-এর কথায় চলছে। পুলিশকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, পুলিশের কাছে আমরা কিছু আশা করি না। কিন্তু আমরা একটা জিনিস তাদের কাছে চাই যে তারা নিরপেক্ষভাবে আচরণ করবে। আমরা যদি আইন ভাঙি তার জন্য দয়া কারোর কাছে চাই না। গণআন্দোলনের প্রয়োজনে

যদি আমাদের প্রচলিত আইন ভাঙতে হয় তার শাস্তি নেওয়ার জন্য আমরা তৈরি থাকব! আমরা শুধু এইটুকুই চাই যে, আমরা যদি কাউকে চড় মারি তবে পুলিশ আমার বিরুদ্ধে চড় মারার অভিযোগই আনবে, বোমা মারার অভিযোগ আনবে না — যেটা তারা হামেশাই করে। এগুলো বাড়াবাড়ি। যে দল অন্যায় করছে, আর যারা অন্যায় রুখছে তাদের দু'জনকে এক করে দেখিয়ে দু'দলই মারামারি করছিল বলে তারা রিপোর্ট দিচ্ছে। আবার এর মধ্যে যারা দুর্বল পক্ষ, গ্রেপ্তার করার বেলায় শুধু তাদেরই করছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় সম্পর্কেও আপনাদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে চাই। বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার মূল কথা হচ্ছে, বিপ্লবীরা কোন পরিস্থিতিতেই তাদের সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে গোলমাল করে ফেলে না এবং কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা অপ্রস্তুত থাকতে পারে না। একটা কথা মনে রাখবেন, শাসকশ্রেণী, কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এবং বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর সামাজিক সমর্থন হিসাবে যারা কাজ করছে সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে। আমাদের দল শ্রমিকশ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী দল কি বিপ্লবী দল নয় এটা নিয়ে সি পি আই(এম), নকশালপন্থী বা মার্কসবাদী বলে নিজেদের পরিচয় দেয় এমন যে সমস্ত দল আমাদের দেশে আছে তাদের সংশয় যতই থাকুক, এ দেশের রাষ্ট্রশক্তি এবং বুর্জোয়াদের কিন্তু আমাদের দলকে চিনতে ভুল হয়নি। অনেক আগে থেকেই তাদের আসল বিপদ কোথায় তারা খানিকটা খানিকটা ধরছিল এবং তাদের একটা চোখ আমাদের দিকে ছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালের পর থেকে তারা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে তাদের সত্যিকারের বিপদটা কোথায়। আপনারা মনে রাখবেন, বুর্জোয়ারা কতকগুলো দলকে দেশের সামনে বিপদ বলে দেখায়, কিন্তু আসলে বিপদ মনে করে না। আর যে দলকে বুর্জোয়ারা সত্যিই বিপদ বলে মনে করে সেই দলকে তারা সহজে দেখাতে চায় না যাতে সেই দলের শক্তিবৃদ্ধি না ঘটে। বুর্জোয়াদের কৌশল হচ্ছে, যে পার্টিকে তারা সবচেয়ে বিপদ বলে মনে করে, যতক্ষণ না সেই পার্টি বাস্তবে তাদের বিপদ সৃষ্টি করার মত শক্তিসঞ্চয় করছে এবং আন্দোলনের স্বীকৃত শক্তি হিসাবে 'অ্যাপিয়ার' করছে (দেখা দিচ্ছে) ততক্ষণ তার কথাটা জনসাধারণের কাছে তারা যতটা সম্ভব চেপে রাখতে চায়। কারণ এটা প্রকাশ হয়ে গেলে মানুষের মধ্যে সেই দল সম্পর্কে যে 'ইলেক্‌ট্রিফাইং এফেক্ট' হবে মানুষ তার ফলে যদি সেই দলকে গ্রহণ করতে থাকে তাহলে আর তাদের উপায় নেই। কাজেই সেই দল সম্পর্কে তাদের সমস্ত প্রচারযন্ত্রকে তারা এমনভাবে চেপে দেয় যাতে মানুষের মধ্যে সেই দলের প্রচার যতটা সম্ভব কম হয়। নেহাৎ না ঠেকলে বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলিতে সেই দল সম্বন্ধে কোন প্রচার আসে না, আর যদি আসেও তাহলে সেই দল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচার করাই হ'ল

বুর্জোয়াদের রীতি। আর বুর্জোয়াদের কৌশল হচ্ছে, যে সমস্ত দল বিপ্লবের কথা বলে অথচ যাদের থেকে সত্যিকারের বিপ্লবের ভয় নেই তাদের 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' খেলা করতে দিয়ে তারা সেইটাকেই ভয়ানক কাণ্ড হচ্ছে বলে প্রচার করে এবং 'ল-অ্যান্ড-অর্ডারের' (আইন-শৃঙ্খলার) দোহাই দিয়ে তাদের দমনযন্ত্রগুলিকে আরও সংহত করে। এইভাবে সত্যিকারের বিপ্লবীদের বিপ্লবের আয়োজনটাকে তারা নষ্ট করে দেয়। এ হ'ল বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রের একটা বিশেষ দিক।

আপনারা দেখেছেন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রচার খুব দ্রুত গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই যে এত নাম দেখতে দেখতে তাদের ছড়িয়ে পড়ল এটা কী করে হ'ল? এ কি তাদের কাগজ দেশব্রতী পড়ে হয়েছে? সেই কাগজের সার্কুলেশান কত? তাহলে এটা তাদের দ্বারা হয়নি। এ কথাটা আমি নকশালপন্থী বন্ধুদেরও গভীরভাবে ভেবে দেখতে বলব। গোটা দেশের কোনায় কোনায় নকশালবাড়ির নাম ছড়িয়ে দিয়েছে কারা? ছড়িয়ে দিয়েছে বুর্জোয়া প্রেস। কেন? তাদের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের এই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তির হাতে দমননীতির অস্ত্র জুগিয়ে দেওয়া। যে আন্দোলনকে সত্যি সত্যিই বুর্জোয়ারা ভয় পায়, যে আন্দোলনের প্রসার লাভ ঘটলে বিপ্লব সত্যিই ঘটতে পারে বলে তারা মনে করে সেই আন্দোলনের খবর তারা চেপে দেয়। সেই বিপ্লবের তত্ত্বের তারা প্রচার করে না। সেই নেতাদের তারা পাবলিসিটি দেয় না। আমার কথাটা আপনারা মিলিয়ে দেখবেন। কত দল আমাদের চেয়েও অনেক ছোট সমাবেশ করে। অথচ তাদের কথা প্রেস বড় করে প্রচার করে। তারা যাই বলুক তাদের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে নিয়ে যায়। অথচ আমাদের মিটিং-এ লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। কাগজ সেইভাবে প্রচার করেছে? করেনি। যতটুকু তারা না দিয়ে পারে না ততটুকুই দেয়। আর যতটুকু যুক্তফ্রন্টে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে মতভেদ আছে সেইটাকে ট্যুইস্ট করে এক শরিকের সঙ্গে আর এক শরিকের ঝগড়া লাগিয়ে যুক্তফ্রন্টকে ভাঙবার তাদের যে চেষ্টা, আমাদের ঠিক সেইরকমের খবরগুলো কিছু কিছু তারা ছাপে। মার্কসবাদী ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে, যে জিনিসে বুর্জোয়াদের ভয়, বুর্জোয়ারা চেষ্টা করে প্রথমত তার প্রচার না দিয়ে তাকে চেপে দিতে। ফলে বিপ্লবী দল যা পারে নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী প্রচার করে। জনতার কাছ থেকে পয়সা তুলে সেই পয়সায় কর্মীদের দিয়ে দলের মতবাদ মানুষের কাছে নিয়ে যায়। আর অন্যদের, যারা বিপ্লবী বুক্‌নি নিয়ে চলে, কিছু কিছু লড়ালড়িও করে, কিন্তু আসলে বিপ্লবী নয়, তাদের নানা রোমান্টিক কাহিনী, বিপ্লবের সব নরম গরম স্বপ্নময় কাহিনী কাগজে ছড়াতে থাকে।

এ কথার মানে এ নয় যে, কোন সময়ই বিপ্লবী দল পাবলিসিটি পায় না। কিন্তু

সে ততটুকুই পায় যতটুকু সে তার নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি বা আন্দোলনের প্রভাবে বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রকে দিতে বাধ্য করে, যেটুকু না দিয়ে তাদের উপায় থাকে না — যেটা একটা জ্বলন্ত ঘটনা হিসাবে মানুষের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এইরকম হলে তাকে অস্বীকার করার উপায় বুর্জোয়াদেরও নেই, প্রেসেরও নেই। কিন্তু তবু তাদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকে তার গুরুত্বকে খানিকটা খাটো করে দেওয়ার এবং তাকে খানিকটা ট্যুইস্ট করবার, বিকৃত করবার। এই হ'ল বুর্জোয়াদের, প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্রিয়াকলাপের ঢং এবং ধরন। এইরকম পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলায় যে যুক্তফ্রন্ট সরকার আছে সেই সরকারের ভিতরে আমরা একক এবং বাইরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শক্তি এবং প্রেস এসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একক। কিন্তু জনতার সঙ্গে থাকার অর্থে আমরা একক নই। জনতার সঙ্গে আমরা আছি কিন্তু জনসমর্থনও আমাদের পর্যাপ্ত নেই। বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ আমাদের সম্বন্ধে এখনও ভাল জানে না বা জানলেও ভুল জানে। আমাদের পার্টির নাম হয়তো এখন খানিকটা খানিকটা জনসাধারণ বেশি জানছে এবং আমাদের দলের প্রতি আকর্ষণও হয়তো হচ্ছে, কিন্তু সে আকর্ষণও খানিকটা বিভ্রান্তি নিয়ে আকর্ষণ। যেমন দেখেছি ঘেরাও সম্বন্ধে আমাদের দলের ভূমিকা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ দুই-ই আছে। কিন্তু আকর্ষণও যেখানে হয়েছে সেটাও দলের নীতি বুঝে হয়নি। যারা আকৃষ্ট হয়েছে তাদেরও অনেকে এ সম্পর্কে আমাদের দল যা বলতে চাইছে তা জানেন না।

যেমন, জনগণের চেতনার নিম্নমানের সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া প্রেস ঘেরাও নিয়ে একটা হৈ চৈ তুলে দিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রগতিশীল শ্রমনীতিকে হেয় করা — যে শ্রমনীতি ১৯৬৭ সালের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় আমাদের দলই ঘোষণা করেছিল। সে সময় আমি বারবার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলাম যে, এ ব্যাপারে কোন উগ্র আচরণকেই আমাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। কারণ, পুঁজিবাদী সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে হবে, সে বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম। কিন্তু প্রশ্ন যেটা দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে, সংবিধান বা আইনের প্রশ্নটিকে বিপ্লবীরা কী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে। নিঃসন্দেহে একমাত্র জনস্বার্থ রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিষয়টিকে তারা দেখতে পারে। আমি সে সময় ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম যে, 'এথিকস ও জুরিসপ্রুডেন্সে'র (নীতি ও আইনশাস্ত্রের) ছাত্রমাত্রই জানেন যে, এই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় যাহাই আইনসঙ্গত তাহাই সবসময় ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং মানবিকতাসম্মত নাও হতে পারে। আবার কোন জিনিস প্রচলিত আইনের চোখে বেআইনি হলেই তা অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অমানবিক হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই আমরা

বলেছিলাম যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাজ হবে জনগণের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে উৎসাহ দেওয়া। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার একদিকে দেখবে যাতে জনগণের ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোতে পুলিশ হস্তক্ষেপ না করে। এর ফলে জনগণের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো খানিকটা নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবে — যেগুলো পূর্বেকার কংগ্রেস সরকারের আমলে সবসময়ই নির্মমভাবে দমন করা হত। অপরদিকে এই সংগ্রাম চালাতে চালাতেই এই সংগ্রামের পটভূমিতেই আমাদের সাহসের সাথে জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও পুরনো আইনগুলিকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি সাহস, প্রত্যয় ও দৃঢ়তার সাথে জনস্বার্থে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই সম্ভবপর সংস্কারগুলি করতে পারে, দুর্নীতি দূর করতে পারে, আমলাতন্ত্রকে কন্‌ট্রোল করতে পারে এবং ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে তবেই জনস্বার্থে সত্যিকারের কাজ করা হবে। কিন্তু ‘ঘেরাও’-এর নামে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরা যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে তারই সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল এই নীতিটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করেছে।

বাস্তবিকপক্ষে ঘেরাও সম্পর্কে বুর্জোয়ারা আমাদের দলের বক্তব্য বলে যা প্রচার করেছে — যা আসলে দল বলতে চায়নি — বুর্জোয়াদের সেই প্রচারকেই দলের বক্তব্য বলে অধিকাংশ মানুষ গ্রহণ করেছে। এর কারণ ব্যাপক জনতার মধ্যে আমাদের সেই সংগঠন নেই, প্রচারের যন্ত্র আমাদের নেই। এই বিরাট জনশক্তির সঙ্গে জনসংযোগ রক্ষা করতে হলে দলের সংগঠন যে আকারে পরিবর্ধিত হওয়া দরকার সেই তুলনায় আজও আমরা শক্তিহীন। বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার মত উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তির অভাব, অর্থাৎ বিপ্লবী পার্টির এই তুলনামূলক শক্তিহীনতা ভারতবর্ষের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন এবং গণআন্দোলনগুলোর সামনে আজ একটা মূল সমস্যা। অমুক দলের তুলনায় আমাদের শক্তি বেশি কিনা বা অমুক পার্টি থেকে আমাদের জনসাধারণকে জড়ো করার ক্ষমতা বেশি কিনা, বা এতগুলো জায়গায় অন্যদের থেকে দুর্ধর্ষ শ্রেণীসংগ্রাম আমরা পরিচালনা করেছি — এসব বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়ই নয়। বাস্তব হচ্ছে, যদি শুধু পশ্চিমবাংলার পরিপ্রেক্ষিতেও চিন্তা করি তাহলেও দেখব সেই তুলনায় আমরা শক্তিহীন। অন্য কোন্ কোন্ দলের তুলনায় আমাদের শক্তি কত বেশি — এ নিয়ে আমাদের আত্মসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। সরকারে আমাদের একজন মন্ত্রী রয়েছে এই ভেবে ফিলিস্টাইন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট নেতাদের মত আমরা গৌরববোধ করতে পারি না। এরকম

মনোভাব আমাদের হওয়া উচিত নয়। এমন কী দল হিসাবে বামপন্থীদের মধ্যে যারা আজও আমাদের থেকে বড়, কাল যদি তাদের থেকেও আমরা শক্তিমান হতে পারি, তাহলেও বুঝতে হবে ভারতবর্ষের গণসংগঠনগুলো বিপ্লবের রাস্তায় চালাবার, জনগণের ওপর বিপ্লবী মতবাদের প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনেক দূরে। সেই তুলনায় আমরা যে ছোট, সেই ভাবনা আমাদের পীড়া দেওয়া দরকার। পীড়াটা হতাশাগ্রস্ত হওয়ার জন্য নয়, কত দ্রুত এই সীমিত অবস্থার মধ্যে, অসুবিধার মধ্যে, আমাদের ক্ষমতার মধ্যে আমরা সেই শক্তি অর্জন করতে পারি, পীড়া তার জন্য হওয়া উচিত। আমাদের দিক থেকে প্রচেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। যদিও আমরা জানি, আমরা চেষ্টা করলেও বিপ্লব না হতে পারে। কারণ বিপ্লবের পরিপূরক বহু পরিবেশ, নানান দিক থেকে তার অবস্থা বিপ্লব সফল করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও যদি আমরা বিপ্লব করে যেতে না পারি, তাহলে বুঝতে হবে, ঐতিহাসিকভাবেই সেটা হওয়া সম্ভব ছিল না। তাতে আমাদের অন্তত দোষ দেওয়ার কেউ থাকবে না। আমরা নিজেরা ইতিহাসের কাছে বলে রেখে যেতে পারব যে, আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি না থাকে, এইটাই হবে আমাদের সাধনা।

আমাদের এই ত্রুটি দূর করবার জন্যই আজকের জটিল পরিস্থিতিটা বোঝা দরকার। আমাদের মধ্যে অনেক সময়ই একটা ঢিলেঢালা, গতানুগতিক মনোভাব কাজ করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, জনসংযোগ এবং দৈনন্দিন রুটিন ওয়ার্কগুলির মধ্যেও পরিকল্পনা থাকা দরকার যাতে দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে সেগুলো করা যায়। আমাদের অবশ্যই দেখা দরকার, কীভাবে পরিকল্পিতভাবে জনসাধারণের মধ্যে আমাদের দলের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনটি নিয়ে গিয়ে জনতাকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করা যায় এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের আদর্শগত-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মান ও বিপ্লবী চরিত্র আরও উন্নত করা যায়। এই দিকটি খেয়ালে রেখেই আমি এখন সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

বিপ্লবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং বিপ্লবের পরিপূরক যে কোন কাজই এক ধরনের সংগ্রাম

একজন কমরেড প্রশ্ন করেছেন, দৈনন্দিন গতানুগতিক পার্টির কাজ কি আমাদের বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করে? এখানে গতানুগতিক কাজ বলতে কর্মীটি কী বলতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। এই গতানুগতিক কাজ বলতে তিনি যদি শুধু কতগুলো 'স্টিরিওটাইপড্', বাঁধাধরা রুটিন ওয়ার্ক —

যেমন নিয়মিত দলের কাগজ বিক্রি করা, কাগজ নিয়ে 'ডোর-টু-ডোর অ্যাপ্রোচ' করা (বাড়ি বাড়ি যাওয়া), স্ট্রিট কালেকশন করা, পোস্টারিং করা, পার্টি অফিসে আসা, পার্টি সেন্টারগুলোতে 'অ্যাসোসিয়েশন' (সাহচর্য) দেওয়া, ক্লাস 'অ্যাটেন্ড' করা (যোগ দেওয়া) বুঝে থাকেন — যদি কর্মীদের ব্যক্তিগতভাবে এবং একটা এলাকায় যত কর্মী রয়েছে সমষ্টিগতভাবে স্থানীয় জনসাধারণ যাদের আশেপাশে তারা থাকেন তাদের সাথে জনসংযোগ না থাকে, জনসাধারণের গণআন্দোলনগুলির সাথে সংযোগ না থাকে বা ডোর-টু-ডোর অ্যাপ্রোচ করে ব্যক্তিগত সংযোগের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে তারা যদি রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রচার না চালান এবং এ সম্পর্কে তাদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং প্রচার করবার কর্মপদ্ধতি না থাকে এবং সেইসব জনসাধারণকে নিয়ে গণসংগঠনগুলো গড়ে তোলবার চেষ্টা এবং পরিকল্পনা না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই এই ধরনের রুটিনমাফিক কাজের দ্বারা একটা সত্যিকারের বিপ্লবী চরিত্র অর্জন অসম্ভব। কর্মীদের মনে রাখতে হবে, জনসাধারণের মধ্যে পড়ে থেকে প্রতিদিন রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালানো, জনতার সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার মারফত সেই প্রচারকার্যের তীব্রতা ঘটানো, গণসংগঠনগুলো গড়ে তোলবার পরিকল্পনা, গণআন্দোলন যেমন যেমন আসছে তাতে অংশগ্রহণ করা, আবার গণআন্দোলনগুলো কীভাবে গড়ে তোলা যায় তার পরিকল্পনা এবং চেষ্টা করে চলা — এগুলোও এক ধরনের সংগ্রাম এবং এগুলো গণআন্দোলনের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের চেতনার, সংগঠন গড়ে ওঠার একটা স্তরের এক ধরনের সংগ্রাম। এ সংগ্রামও বিপ্লবী সংগ্রাম।

বিপ্লবীদের সংগ্রাম বলতে শুধুমাত্র একটা বিশেষ ধরনের সংগ্রাম — অর্থাৎ মাঠে-ময়দানে সবসময় ব্যারিকেড করে লড়ালড়ির সংগ্রাম বোঝায় না। কারণ, এ সংগ্রামটা একদিনে গড়ে ওঠে না বা কখনও কখনও গণআন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করার সাথে এ ধরনের সংগ্রাম যেগুলো আসে সেগুলো লাগাতার চলতে থাকে না। লাগাতার এই ধরনের সংগ্রাম পরিচালনার মত বিপ্লবী সংগঠন — যা একেবারে ক্ষমতা দখলের সংগঠনে রূপ নেবে — সৃষ্টি করতে বিপ্লবীদের দীর্ঘদিন সময় লাগে। একদিকে পার্টি সংগঠন, আর একদিকে গণআন্দোলনের সংগঠন গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী মতাদর্শের প্রচার চালানো — এই তিনটি জিনিসকে সংযোজিত করে প্রতিদিনের যে কষ্টসাধ্য সংগ্রাম — দীর্ঘদিন ধরে সেই সংগ্রাম করে তবে এই অবস্থা গড়ে তুলতে হয়।

সাংগঠনিক দিক থেকে বর্তমানে যে অবস্থায় আমরা আছি, তাতে আজই আমরা বিপ্লবের জন্য কোথাও লড়তে যাচ্ছি না। বা বর্তমানে জনসাধারণকে নিয়ে পুলিশের সঙ্গে হোক্ বা যেখানেই হোক্ একটা লড়ালড়িও চলছে না। আর

তাছাড়া ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বা কোন ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বা অন্যান্য ইস্যুতে কলকাতায় এর আগে যে ধরনের মারমুখী আন্দোলন হয়েছে, লড়ালড়ি হয়েছে সেইরকম যাকে বলে মাঠে-ময়দানে একটা গরম লড়াই তা প্রতিদিনই হয় না। তা এই ধরনের লড়াই যদি না হয়, কর্মীদের প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে, তার ধারণা, তাহলে কীভাবে তারা বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তুলবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এরকম লড়াই বিপ্লবীদের লাগাতার প্রতিদিন গড়ে তোলা কি সম্ভব? না, কোন দেশের বিপ্লবে তা এইভাবে গড়ে ওঠে? তাহলে বিপ্লবীরা তাদের চরিত্র গড়ে তোলে কী করে?

কর্মীদের মনে রাখতে হবে, বিপ্লবী সংগ্রামের অনেক পর্যায় ভাগ আছে — নানান স্তরে তা বিভক্ত। শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় সমাজ-অভ্যন্তরে যখন বিপ্লবের চিন্তার জন্ম হতে থাকে তখন সেই চিন্তাগুলোকে নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হতে থাকে। মানুষ ধীরে ধীরে একজন দু'জন করে সেই চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে বিপ্লব করবার জন্য বিপ্লবী দল গড়ে তোলবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসে। কোন একটা দেশে বিপ্লবী সংগ্রামের একেবারে প্রাথমিক স্তরে যখন এই অবস্থা থাকে সেই দেশের সেই কয়টা বিপ্লবী কি সেই সময়ই বিপ্লবটা শুরু করে দেয়? তারা কয়েকজন রিভলবার পিস্তল নিয়ে গিয়ে যাকে পেল তাকে বা যে কোন একটা লালপাগড়ি পুলিশকে দেখে গুলি করে বিপ্লবটা সেখানেই শেষ করে? তা তো নয়। তাহলে সেই অবস্থায় সংগ্রামটা শুরু হয় কীভাবে? না, বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক প্রস্তুতি দীর্ঘদিন ধরে কষ্টসাধ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের আগে তাদের গড়ে তুলতে হয়। এই সংগ্রামটাই কঠিন সংগ্রাম।

বিপ্লবের সংগ্রাম সম্বন্ধে কারোর যদি এরকম ধারণা হয় যে, মাঠে-ময়দানে ব্যারিকেড করে লড়াই করা বা সশস্ত্র সংগ্রামটাই একমাত্র বিপ্লবী সংগ্রাম, আর বিপ্লবের সংগঠনের জন্য বা বিপ্লবের এই সশস্ত্র সংগ্রামটাকে গড়ে তোলবার জন্য তার আগে যে হাজার এক ধরনের সংগ্রাম বিপ্লবীদের করতে হয় সেগুলো বিপ্লবী সংগ্রাম নয়, তাহলে হবে মারাত্মক ভুল। এরকম ধারণা একধরনের পেটিবুর্জোয়া হতাশাবাদ থেকে, 'রোমান্টিসিজম' থেকে, নিরুৎসাহবাদ থেকে সমাজে জন্ম নেয়। সমাজে যখন হতাশা আসতে থাকে, নিরুৎসাহ আসতে থাকে, 'ফ্রাসট্রেশন' আসতে থাকে তখন সমাজে অগ্রণী যুবচেতনার যে অংশের মধ্যে পুরোপুরি বিপ্লবী সচেতনতা নেই, বিপ্লব গড়ে উঠবার জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে যারা কিছু জানে না — অর্থাৎ কত জটিল প্রক্রিয়ায় নানান সংগ্রামগুলোকে সংহত করতে করতে তবে একটা সত্যিকারের বিপ্লবী সংগ্রামের যে স্বপ্ন আমরা দেখি সেই সংগ্রামে তা রূপ নেয় এই ধারণা যাদের নেই — তেমন অসচেতন

কর্মীরাই ছটফটানিতে মরে, তারা মনে করে কিছুই হচ্ছে না। তারা বিপ্লবী সংগ্রাম বলতে এই যে আগেই বললাম, সংগ্রামের একটা বিশেষ ফর্ম, অর্থাৎ একটা বিশেষ ধাঁচের যে সংগ্রাম, তাকেই বিপ্লবী সংগ্রাম বলে মনে করে।

তারা বুঝতেই পারেনি, সংগ্রামের কোন ফর্ম এবং ধাঁচাটিই এককভাবে বিপ্লবী সংগ্রাম, আর বাকিগুলো সব অবিপ্লবী সংগ্রাম — বিষয়টা এরকম নয়। তাদের মনে রাখা দরকার, বিপ্লব গড়ে তোলবার পরিপূরক সমস্ত সংগ্রামগুলোই বিপ্লবী সংগ্রাম। পার্টি গড়ে তোলবার জন্য যে মতাদর্শগত প্রচার চলে সেটাও একটা কঠিন বিপ্লবী সংগ্রাম। এই সংগ্রাম পরিচালনায় অনেক ধৈর্য দরকার। কারণ, এ সংগ্রামে জেতা অনেক সময় মাঠে-ময়দানে লড়াইয়ের চেয়েও কঠিন হয়। চরম ফ্রাসট্রেশনের মধ্যে বিপ্লবী সংগ্রামে একজন একজন করে মানুষকে যুক্ত করা বা বিরুদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে বিপ্লবী মতবাদের আধিপত্য স্থাপনা করার যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম মাঠে-ময়দানে বন্দুক-রাইফেল নিয়ে বিপ্লবীরা যে লড়ে সেই লড়াই থেকে কোন অংশে সহজ নয়। যেমন, বিপ্লবোত্তর চীনে যখন বুর্জোয়াশ্রেণীকে আর ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের প্রশ্ন নেই, আর্মি-পুলিশ-রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে লড়ালড়ির প্রশ্ন নেই, তখন বিপ্লবী সংগ্রামটা সেখানে কত জটিল হয়ে পড়ল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আবার কী প্রচণ্ড আদর্শগত লড়াইয়ের সৃষ্টি করল। যখন চিয়াং কাইশেক-এর আর্মির বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করে তারা বিপ্লব করেছিল, বিপ্লবোত্তর যুগের সাংস্কৃতিক বিপ্লবটা তার থেকে শুধু কঠিন ছিল না, আরও জটিল আরও কম্‌প্লেক্স ছিল।

কাজেই বিপ্লবী সংগ্রাম বলতে সংগ্রামের শুধু একটাই ফর্ম বোঝায় না। সংগ্রাম কথাটা সাধারণত এরকম হয়ে পড়েছে যে, দলের যেটা প্রাত্যহিক কাজ তাকে আমরা ‘স্ট্রাগ্‌ল’ মনে করি না। যেটা আদর্শগত সংগ্রাম — যেমন দলের কাগজ চালানো, দলের কাগজ বিক্রি করা, মতবাদে মতবাদে সংঘর্ষ পরিচালনা করা, প্রোপাগান্ডা চালানো, বিরুদ্ধ মতবাদের প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে বিপ্লবী রাজনৈতিক মতাদর্শের সঠিক প্রোপাগান্ডা চালানো, আমরা মনে করি, এগুলো লড়াই নয়, এগুলো সংগ্রাম নয় — এগুলো রুটিন ওয়ার্ক। সেইজন্য আমাদের কাজের গতিও গতানুগতিক হয়ে পড়ছে।

ধরুন, যারা পার্টি অফিসের কর্মী তাদের অফিসের কাজ চালাতে প্রতিদিন হাজার এক ধরনের টেক্‌নিক্যাল কাজ করতে হয়। এগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, এমনকী একদিনের জন্যও তা ফেলে রেখে দিলে পার্টির সার্বিক কার্যকলাপ চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে — যেমন, প্রতিদিন সাংগঠনিক নানা খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া এবং যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হবে, পার্টির

কাজ পরিচালনার প্রতিদিনের সে 'সিস্টেম', তা মার খাবে এবং একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবে। একই কথা 'পার্টি কমিউন' এবং 'পার্টি সেন্টার'গুলো সম্পর্কেও বলা চলে। সেখানেও পার্টি কমিউন এবং সেন্টারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, সেখানকার প্রতিটি সদস্যের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া, তাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা এবং বহু রকমের রুটিন কাজ প্রতিদিন করতে হয়। বাইরে থেকে এসব কাজ খুবই নিরুৎসাহব্যঞ্জক, সাধারণ ও একঘেয়ে মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, এর মধ্যে আবার বিপ্লবের কী আছে ! কিন্তু বাস্তবে তা নয়। যেমন ধরুন, পার্টির পত্রপত্রিকা নিয়মিত ছেপে বের করা এবং সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো ইত্যাদির জন্য পার্টির প্রেস চালাতে গিয়ে নানাধরনের রুটিন কাজ প্রতিদিন করতে হয়। এগুলি না করলে পার্টি তার আদর্শগত প্রচারের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত হবে। এইসব কাজের গুরুত্ব এত বেশি। এগুলো সবই পার্টির সার্বিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেরই অঙ্গ — যেগুলো বিপ্লবের পরিপূরক এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীন করে পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু, গোটা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে না মিলিয়ে যদি এগুলোকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখি তবে এইসব নানাধরনের টেক্‌নিক্যাল কাজগুলোকে আমাদের মনে হবে অতি সাধারণ, গুরুত্বহীন এবং নিছক একঘেয়ে রুটিন কাজ।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে শান্ত মনে, আনন্দের সঙ্গে বিপ্লবী সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্যমুখীনতা নিয়ে এই ধরনের দায়িত্ব পালন করে যেতে পারার জন্য বিপ্লবী চেতনার অনেক উচ্চ মান থাকা দরকার। অনেক কমরেডেরই উপযুক্ত বিপ্লবী সচেতনতার অভাবে এমন ভুল ধারণা আছে যে, এইসব রুটিন কাজগুলো নিতান্তই গুরুত্বহীন তুচ্ছ কাজ, গণসংগ্রাম বা গণআন্দোলন গড়ে তোলার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এগুলো নয়। এই ধরনের চিন্তা পুরোপুরি ভ্রান্ত। বরং দেখা যায়, এই ধরনের তথাকথিত তুচ্ছ কাজ যারা যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারে, যে কোন পরিস্থিতিতে পার্টির দায়িত্ব তারা অনেকসময় অন্য অনেকের চেয়ে যোগ্যতরভাবে পালন করতে পরে।

এ প্রসঙ্গে আরও দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলব। একজন উন্নত কমিউনিস্টের চরিত্রের অন্য অনেক কিছুর মধ্যে একটা প্রধান দিক বা 'অ্যাসিড টেস্ট' হ'ল, সে যখনই যে কাজটা করে সেটা এমন নিষ্ঠার সঙ্গে নিখুঁত ও ত্রুটিহীনভাবে করে যে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। এ কথাটা ছোট-বড় সবরকম কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সে প্রতিটি কাজ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে একাগ্রতা নিয়ে নিখুঁতভাবে করে। এমনকী ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করার মতো একটা সাধারণ কাজও সে সৃষ্টিশীল মন নিয়ে করে। কারণ একজন বিপ্লবীর কাছে কোন কাজই

তুচ্ছ নয়। আমি আপনাদের বলব, কোন কাজই আপনারা ঢিলেঢালা মনোভাব নিয়ে করবেন না। কারণ, যেকোন কাজই যদি আপনারা তুচ্ছ মনে করে গুরুত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে না করেন, তাহলে শুধু যে কাজটাই নষ্ট হয় তা নয়, তা আপনার চিন্তাপ্রক্রিয়ার মধ্যেও 'ইন্‌টিগ্রেশন' গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে। কাজ সম্পর্কে ঢিলেঢালা দৃষ্টিভঙ্গি চরিত্রের ইন্‌টিগ্রিটি গড়ে ওঠার পথেও বাধা। সুতরাং কোন কাজ যখন নেবেন — তা ছোটই হোক, বড়ই হোক — সমস্ত মন দিয়ে নিখুঁতভাবে তা করার চেষ্টা করবেন।

তাছাড়া আমরা সকলেই জানি, পার্টি কমিউন বা পার্টি সেন্টারগুলোও এক ধরনের পার্টি সংগঠন, যদিও তা ভিন্ন চরিত্রের। সুতরাং পার্টি সংগঠন হিসাবে এই সেন্টারগুলোও সমস্ত দিক থেকে সুষ্ঠুভাবে চালানোর বিষয়টা সেন্টারের সমস্ত সদস্যেরই — মহিলা-পুরুষ উভয়েরই ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু, প্রায়শই দেখা যায়, এইসব সেন্টারের গৃহস্থালীর কাজ যা বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন করতেই হয় তা কেবলমাত্র মহিলা কমরেডরাই করে থাকেন — এমনকী অনেকসময় তাদের পক্ষে তা অসহনীয় কষ্টকর হলেও তাদেরই তা করতে হয়। অন্যেরা নিতান্ত বাধ্য না হলে ঐসব কাজে হাত লাগান না। আমি জানি না, দলের নেতারা এই সমস্যার ঠিক ঠিক সমাধানের বিষয়টি নিয়ে গুরুতরভাবে এখনও পর্যন্ত কিছু ভেবেছেন কিনা।

আর একটা বিষয়ও আমার নজরে পড়েছে। আমি সাধারণ কমরেডদের কথা বলছি না, নেতাদের কথা বলছি। কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় কমরেড, শারীরিকভাবে যারা এখনও সবল এবং বয়সও যাদের এমন কিছু বেশি হয়নি, তাদের একটা অদ্ভুত অভ্যাস আমি দেখতে পাই। ছোটখাট কাজ যা তাঁরা নিজেরাই অনায়াসে করতে পারেন এবং করা উচিত — যেমন ধরুন, এক গ্লাস জল নিয়ে খাওয়া — সেটাও তাঁরা নিজেরা করেন না, তাঁরা জুনিয়ার কমরেডদের এনে দিতে বলেন। জুনিয়ার কমরেডরা এর জন্য কিছু মনে করেন না, একথা ঠিক। কিন্তু সেটা তো তাদের দিক। নেতাদের দিক থেকে এইসব কাজ করার অভ্যাস বা চর্চা না থাকা ঠিক নয়। যদি থাকে তাহলে এই বদ অভ্যাস শুধু তাঁদেরই ক্ষতি করবে না, অন্যেরা ধীরে ধীরে এইসব বদ অভ্যাসের সহজেই শিকার বনে যেতে পারে। যাই হোক, রুটিন ওয়ার্ক সম্পর্কে যে কথা বলছিলাম, এখন আবার সেই কথায় ফিরে আসা যাক্।

সর্বব্যাপক প্রবল হতাশার মধ্যেও কষ্টসাধ্য রাজনৈতিক প্রচার কার্য চালানোর গুরুত্ব

আমি যে প্রাত্যহিক কাজের কথাগুলো উল্লেখ করে গেছি, আপনাদের বোঝা দরকার, এগুলো নিছক রুটিন ওয়ার্ক নয়। এখানে অনেক 'কন্‌সেন্‌ট্রেশন' (মনের

একাগ্রতা) দরকার, নেতৃত্ব করার ক্ষমতার দরকার, 'অর্গানাইজিং এবিলিটি'র (সাংগঠনিক ক্ষমতার) দরকার, 'থিওরেটিক্যাল এবিলিটি'র (তত্ত্বগত ক্ষমতা) দরকার, 'ডিটারমিনেশন' (দৃঢ়তা) দরকার, 'ডগেড্‌নেস' (অনমনীয়তা) দরকার। দেশে যখন আন্দোলনের একটা 'ফিভার' (প্রবল উত্তেজনা) আসে, কোন একটা আন্দোলনের বান ডাকতে থাকে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে লড়াই চলতে থাকে, মানুষ লাফাতে থাকে, তখন যে মানুষগুলো কোনদিন লড়তে চায় না তারাও গরম হয়ে যায়, লড়াইতে অনেক লোক জুটে যায়। সেদিন লড়াইয়ে লোক পাওয়ার আর অসুবিধা হয় না। যে লড়াইকেই একমাত্র বিপ্লবী লড়াই বলে কিছু কর্মী মনে করছেন, সেই লড়াইতে কিন্তু যাদের এতটুকু বিপ্লবী চেতনা নেই সেই মানুষগুলোও এসে সামিল হয়। কারণ, দেশে তখন বিপ্লবের বা লড়াইয়ের একটা ফিভার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন বাজার ঠাণ্ডা, যখন প্রতিক্রিয়াশীলরা জোর আক্রমণ চালাচ্ছে, অথচ জনসাধারণকে নিয়ে সত্যিকারের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো গড়ে তোলা যাচ্ছে না সেই সময়ে মানুষকে জড়ো করে আন্দোলনগুলো আমরা গড়ে তুলব কীভাবে? সেই বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিরুদ্ধবাদীদের প্রচারের বা মতবাদের শ্রেণীচরিত্রকে 'অ্যানালিসিস' (বিশ্লেষণ) করে তর্কবিতর্ক, আলোচনা এবং 'প্রোপাগান্ডা'র (প্রচারের) দ্বারা জনসাধারণের সামনে জলের মতন তুলে ধরে দেখাতে হবে, এইসব প্রোপাগান্ডার দ্বারা, বড় বড় কথার দ্বারা, নরম-গরম বুক্‌নির দ্বারা তারা জনতাকে কীভাবে বিভ্রান্ত করছে। এইভাবে কষ্টসাধ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের প্রচারকে পরাস্ত করে জনতাকে বুঝিয়ে সংগঠন গড়ে তোলাই হবে তখন আমাদের কাজ। এ সংগ্রামটা অনেক জটিল। ফ্রাসট্রেশনের মধ্যেও, যখন আশা নেই, ভরসা নেই, আন্দোলনের একটা টগবগে আবহাওয়া নেই — শুধু বিপ্লবী চেতনার ভিত্তিতে 'ভলান্টারিলি' (স্বেচ্ছায়) নিজেকে ঠিক রেখে এইভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়া একমাত্র শ্রেণী সচেতন 'ডেডিকেটেড' (নিবেদিত প্রাণ) কর্মী ছাড়া সম্ভব না। বিপ্লবী চেতনা না থাকলে এটা করা যায় না। সেই সময়ে জনতার মধ্যে পড়ে থেকে এই কাজটি পরিচালনার জন্য যতটুকু রুটিন ওয়ার্ক দরকার, প্রোগ্রামে জয়েন করা দরকার সেটাও বিপ্লবী চেতনার দৃঢ়তা না থাকলে মানুষ করতে পারে না।

অনেকের কাছে এই রোজ পড়ে থেকে প্রচার করা, মিটিং-এ যাওয়া, কাগজ বিক্রি করা, ডোর-টু-ডোর অ্যাপ্রোচ করা — এসব ভাল লাগে না। তাদের ধারণা, যাহোক একটা কিছু হোক, যেভাবেই হোক্ একটা এস্‌পার-ওস্‌পার করে দিয়ে আসবেন, অর্থাৎ বিপ্লবের কাজটা যা হয় দু'চারদিনে শেষ করে দিয়ে তারপর না হয় আবার পাঁচদিন একটু আরাম করবেন। তাদের এভাবে মনে করার কারণ কী?

এর কারণ, দলের রাজনৈতিক ‘অ্যাপ্রোচ’টাও তাঁরা ভাল করে করতে পারেন না, সংগ্রামটাও ভাল করে গড়ে তুলতে পারেন না, মানুষের মধ্যে পড়ে থেকে আলোচনা এবং প্রোপাগান্ডার দ্বারা বিপ্লবী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ এবং উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেন না এবং এইসব প্রচারের দ্বারা নতুন নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন না, যুবসম্প্রদায়কে সংগঠনের পেছনে টেনে আনতে পারেন না, গুন্ডাশাহীর বা নানান উগ্র মতবাদের হাত থেকে যুবকদের রক্ষা করতে পারেন না। ফলে তাঁরা মনে করেন, কিছুই হচ্ছে না। মনে করেন, একটা কিছু না হলে বিপ্লব আর কিছু হচ্ছে না। কিন্তু তাঁরা কি কখনও ভেবে দেখেছেন, সেই একটা কিছু কী করে হবে? সেই একটা কিছু কথাটার মানে কি এই যে, ঘরভর্তি এখানে যে ‘অ্যাড্‌ভান্সড’ ক্যাডাররা আছে, তারা যে যার মতন দু’চারটে বোমা-পটকা যে যা পারে জড়ো করে একদিন রাস্তায় নেমে যাবে? নেমে গিয়ে তারা কী করবে? রাষ্ট্রশক্তির গায়ে তারা একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না। আসলে যাঁরা এভাবে ভাবছেন তাঁরা বুঝতেই পারেননি, আমরা যে বিপ্লবের কথা বলি, যে যুদ্ধ আমরা গড়ে তুলতে চাইছি, তা হচ্ছে শ্রেণীযুদ্ধ অর্থাৎ জনযুদ্ধ। সমস্ত জনতার একটা বিরাট অংশকে সংগঠিত করে বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনায় এবং বিপ্লবের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই একমাত্র সেই ‘প্রোট্র্যাক্টেড’ বা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ সম্ভব। হঠাৎ কোন একটা বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে মানুষের যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, যে আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক মতাদর্শের বা বিপ্লবী তত্ত্বের কোন ‘কন্‌ভিকশন’ (ভিত্তি) নেই, সেই ধরনের ‘স্পোরেডিক’ বা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থেকে এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ কখনই জন্ম নিতে পারে না।

মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দেশের অভ্যন্তরে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলো গড়ে ওঠে সেই আন্দোলনগুলোকে নেতৃত্ব দিতে দিতে তার মাধ্যমে জনতাকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে যদি আমরা জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ারগুলো একদিন গড়ে তুলতে পারি তবেই একমাত্র এ জিনিস সম্ভব। অথচ, আমাদের দেশের আন্দোলনগুলোর চরিত্র কি সেইরকম? এখানে কী ধরনের আন্দোলন হচ্ছে? যেমন, খাদ্যের দাবিতে দেশের অভ্যন্তরে একটা আন্দোলন এসে গেল, লড়াই এসে গেল, তাতে হাজার-হাজার লোক সামিল হ’ল, লড়ালড়ি হ’ল, তারপর সেই লোকগুলো আবার হারিয়ে গেল। কেন হারিয়ে গেল? কারণ, যে হাজার হাজার মানুষ এই আন্দোলনের মধ্যে এসে গেল সেই মানুষগুলো বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আসেনি — বিপ্লব করবার জন্য, বিপ্লবী পার্টি গড়ার জন্য প্রতিদিন সংগ্রাম করার মতন ধৈর্য, চেতনা, ডেডিকেশন, মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। অথচ এ কথাও সত্য যে, তারা হাজারে হাজারে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই লড়াইয়ের ময়দানে এসেছিল। একটা ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে আন্দোলনের

যে আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ায় তারা এসে জড়ো হয়েছিল। এই ধরনের হাজার হাজার মানুষের আন্দোলন প্রতিদিন দেশে গড়ে ওঠে না। মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ জমতে জমতে একদিন যে কোন একটা ইস্যুকে ভিত্তি করে, নেতৃত্ব থাক আর না থাক, সেটা ফেটে পড়ে। এই ফেটে পড়া স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনটার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা না থাকার ফলে, জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার ফলে, কয়েকদিনের মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে যায়, হারিয়ে যায়। ফলে আবার চলে একটা ফ্রাস্ট্রেশনের পিরিয়ড। আবার মানুষগুলো মার খেতে থাকে আর ধুঁকতে থাকে। এইভাবে মার খেতে খেতে আবার একটা সময় ঐরকম স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে তারা ফেটে পড়ে।

আমাদের দেশের নানান আন্দোলন আজ পর্যন্ত যা হয়েছে — একটি-দু’টি-চারটি ঘটনা ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আন্দোলনগুলোর চরিত্র হচ্ছে এই ধরনের। স্বাভাবিক অবস্থায় মার খেতে খেতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে বানের জোয়ারের মতন একটা ‘আপহিভল’ (অভ্যুত্থান) হ’ল, যার মধ্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা বা যার ওপর বিপ্লবী নেতৃত্বের আদর্শগত প্রতিষ্ঠা — এসব কিছুই নেই। ফলে আমরা, যেসব পার্টি ওপর থেকে একটা কমিটি করে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিই তারা আন্দোলনের মধ্যে হাজার হাজার লোক কোথা থেকে এল এবং তারপর কোথায় হারিয়ে গেল তার খবরই রাখি না। যারা ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে ওপর থেকে এই আন্দোলনগুলোতে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দিয়ে আসছে সেই সমস্ত পার্টির কাছে আমরা বারবার বলেছি যে, ওপর থেকে একটা আন্দোলনের ডাক দিয়ে নেতারা জেলে গিয়ে বসে থাকেন, সেনাপতিদের মতন তাঁরা কাজটা করেন না। তাঁদের উচিত এই আন্দোলনের ডাক দেওয়ার সাথে সাথে যে মানুষগুলো আন্দোলনে আসতে চাইছে বিভিন্ন গণকমিটিতে তাদের যুক্ত করে সেই গণকমিটিগুলিকে নেতৃত্বকারী কমিটিতে রূপান্তরিত করা এবং তাদের মাধ্যমেই আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করা, অন্যদিকে আন্দোলন চালাতে চালাতেই বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো। এই মতাদর্শগত সংঘর্ষ ছাড়া জনগণের রাজনৈতিক চেতনা পরিষ্কার হতে পারে না। কারণ, যে দলগুলি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসে আন্দোলন সম্পর্কে তাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক থাকে না। একেকটা পার্টি ‘এজিটেশন’কে (বিক্ষোভ) সামনে রেখে একটু ‘বাংগলিং’ করে। আন্দোলনের মধ্যে জনসাধারণ মরে, লাঠি খায়, গুলি খায় — আর তারা তার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে। তারপর নির্বাচন এলে তাকেই পুঁজি করে জিতে গিয়ে মালাটালা পরে রাজা-উজির-মন্ত্রী হয়ে বসে। ব্যস। এই হচ্ছে বেশিরভাগ দলেরই আন্দোলন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি।

স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভমূলক আন্দোলন নয় সংগঠিত, সচেতন, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনই বর্তমানে প্রয়োজন

অন্যদিকে সত্যিকারের একটা বিপ্লবী দল চায়,এই যে এজিটেশনাল মুভমেন্ট, এর মধ্য দিয়ে যেন অন্তত জনগণের খানিকটা রাজনৈতিক চেতনা, খানিকটা জনগণের বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং জনগণের ক্ষমতা গড়ে তোলবার হাতিয়ার গণকমিটিগুলি রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। এই গণকমিটিগুলি স্থায়ী কমিটি হবে না। এগুলি প্রতিটি আন্দোলনে খানিকটা চেতনা নিয়ে গড়ে উঠবে, আবার আন্দোলনের পর ভেঙে যাবে। এইরকম প্রত্যেকটা আন্দোলনে যদি এই গণকমিটিগুলি খানিকটা খানিকটা রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে তাহলে জনগণ নিজেরাই আন্দোলন পরিচালনা করতে শিখবে এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে শিখবে। জনগণ যখন লড়াইয়ের মধ্যে থাকে তখন তার মধ্যে 'উইস্‌ডম'টা (প্রজ্ঞা) না থাকতে পারে, কিন্তু লড়াইয়ের 'ফারভার'টা (উত্তাপ) খুব সুন্দর থাকে, লড়াইয়ের মনটা খুব পরিষ্কার থাকে। নেতাদের মধ্যে সহজে যে 'ভাইসেস'গুলো (দোষ) ঢোকে, পার্টির মধ্যে যেগুলো ঢোকে জনসাধারণের মধ্যে সেইটা থাকে না। লড়াইয়ের এই ফারভারের সাথে যদি জনগণের রাজনৈতিক চেতনা এবং উইস্‌ডমটা গড়ে ওঠে তাহলে জনসাধারণ নিজেরাই বুঝতে পারবে, কখন আন্দোলন কতদূর নিয়ে যাওয়া চলতে পারে এবং কীভাবে আন্দোলনকে চালানো যায়। যখন এইটা জনসাধারণ করতে পারবে তখন নেতৃত্বকারী দলগুলির মধ্যে কোন্ দল তাদের সত্যিকারের সেই লড়াইতে ভাবের দিক থেকে, আদর্শের দিক থেকে যথার্থ নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের সেই পরিকল্পনায় মদত দিচ্ছে সেটা তারা দেখতে পাবে। আর জনসাধারণের এই দেখতে পাওয়ার মধ্য দিয়ে অবিপ্লবী দলগুলি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। গণআন্দোলন-গুলোকে আমাদের দল এইভাবে অ্যাপ্রোচ করে।

কিন্তু এই ধরনের গণআন্দোলন আমরা চাইলেই তো প্রতিদিন গড়ে ওঠে না। কোন বিপ্লবী দল চাইলেই গড়ে ওঠে না। যে সমস্ত নকশালপন্থী বন্ধুরা 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস', 'লড়তে হবে', 'কৃষকরা গ্রামে গ্রামে এলাকা দখল করে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি কর' বলে স্লোগান তুলছেন আর মনে করছেন বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, তাদের আমি ভেবে দেখতে বলব, সত্যিই কি বিপ্লব শুরু হয়েছে, না এইভাবে বিপ্লব সম্ভব? তাই দেখুন বাস্তবে কী হচ্ছে। বিপ্লবের নামে কফি হাউসে আর পাড়ার রকে গরম গরম কথার ফুলকি ছুটছে আর কিছু কিছু সুদূর গ্রামাঞ্চলে কয়েকজন গিয়ে যেখানে পারছে অস্ত্র নিয়ে লড়ালড়ি করছে। কিন্তু

তাও এই লড়াই কতটা হচ্ছে? কয়টা জায়গায় হচ্ছে? যত বড় দল এবং যত তাদের লোক বলে নকশালপন্থী বন্ধুরা দাবি করেন — যদি পাঁচজন করেও লোক এক একটা জায়গায় গেলেই সঙ্গে সঙ্গে এই লড়াই গড়ে তোলা যেত, তাহলে সারা পশ্চিমবাংলায় এবং ভারতবর্ষের বিরাট অঞ্চল ধরে তো এতদিনে কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত। কিন্তু উঠছে কই? তর্কাতর্কিতে আগুন বেরোচ্ছে, আর ছাত্রদের মধ্যে কৃষিবিপ্লব ইউনিভার্সিটিতে ফেটে পড়ছে। কলেজ ইউনিয়নের মারদাঙ্গার মধ্যে কৃষিবিপ্লব ফেটে পড়ছে। বাস্তবে কৃষিবিপ্লবের দেখা নেই। কারণ এত সহজে এ জিনিস হয় না। তাঁরা যে কৃষিবিপ্লবের কথা বলছেন, তার সাথে আমাদের মতপার্থক্য আছে। আমরা মনে করি, ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, যে কৃষিবিপ্লবের কথা তাঁরা বলছেন তাও যদি তাঁদের করতে হয় তাহলে দীর্ঘদিন ধরে কর্মীরা যাকে বলছেন রুটিন ওয়ার্ক এবং বিরক্তিকর কাজ — এই বিরক্তিকর কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই তাঁদের এগোতে হবে। যত রকমের বুর্জোয়া মতবাদ, কুসংস্কার শ্রমিক আন্দোলন, চাষী আন্দোলনের মধ্যে ঢুকে আন্দোলনগুলোকে বিপথগামী করছে, ক্রমাগত তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে তার পর্দা খুলে দিতে হবে। ভাসাভাসা নয়, আদর্শের একটা পরিষ্কার ছবি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে। আপনাদের মনে রাখা দরকার 'বিপ্লব চাই', — এটা কোন 'কন্‌সেপশন'ই (ধারণাই) নয়। 'লড়াই করতে হবে', 'লড়াইয়ের থেকেই নেতৃত্ব জন্ম নেবে' — এটাও কোন কন্‌সেপশন নয়। কী সেই লড়াই, লড়াইয়ে শত্রু কে, মিত্র কারা, কতরকমের তার জটিল প্রক্রিয়া — কখনও সে প্রত্যক্ষ রাস্তায় সংগ্রামের রূপ নেয়, কখনও সে 'রিট্রিট' (পশ্চাদপসরণ) করে — অর্থাৎ কোন্ সময় লড়াই কী রকমের রূপ নেয় — এসব বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, এই লড়াই কখনও প্রচারধর্মী হয় — তখন সে একইসঙ্গে 'ক্যাডার রিক্রুট' করে, প্রচার করে, কাগজ চালায়, সংগঠন গড়ে তোলে। এ হ'ল সংগঠনের একটা স্তর। আবার এইগুলো করতে করতেই আন্দোলনের ইস্যুকে ভিত্তি করে যখন খানিকটা সংগঠন গড়ে ওঠে তখন প্রচার চালাবার সাথে সাথে আন্দোলনকে সে মাঠে-ময়দানে নিয়ে যায় শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়তে। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তি, তার দমনমূলক যন্ত্র এবং শোষকশক্তির চেহারাটা জনসাধারণকে দেখায়, সাথে সাথে অন্যান্য দল যারা বিপ্লবের নরম-গরম বুক্‌নি দেয়, সমাজতন্ত্রের কথা বলে তারা এই লড়াইয়ের সামনে কী 'অ্যাটিচ্যুড' (মনোভাব) নেয় তা দেখায়। কারণ মতাদর্শগত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যতক্ষণ কোন্ মতটা সঠিক জনসাধারণ না ধরতে পারছে ততক্ষণ বিপ্লবের রাস্তা পরিষ্কার হতে পারে না।

যেমন, আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলি। বাংলা কংগ্রেসও সমাজতন্ত্রের কথা বলে। ফরোয়ার্ড ব্লকও সমাজতন্ত্রের কথা বলে। খোদ জহরলাল নেহেরুও সমাজতন্ত্রের কথা বলে গেছেন। আবার সি পি আই (এম) যে ‘’পিপল্স ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশনে’র কথা বলছে সেও তো সমাজতন্ত্রের জন্যই। ওদিকে সি পি আই এবং নকশালপন্থী বন্ধুরাও বলছেন, পিপল্স ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশন। অথচ, তাদের এই তিন পিপল্স ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশনের নাকি কোন মিল নেই। মানে রেভোলিউশন এক কিন্তু তিনটে তিনরকম। যদি ধরে নিই পিপল্স ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশনই ভারতবর্ষের বিপ্লবের সঠিক লাইন, তাহলেও এই তিনটির মধ্যে কোন্টা ঠিক? এই ঠিক-বেঠিকের লড়াইতে মানুষকে আগে মজাতে হবে। মানুষের মগজে যদি এই ঠিক-বেঠিকের লড়াইটা জমে যায়, মানুষ তা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে, বুঝতে থাকে ঠিক-বেঠিকের লড়াইটা তবেই বিপ্লবের রাস্তা পরিষ্কার হবে।

এই আদর্শগত-মতবাদগত সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়ে দেশে কিছুই হবে না। জনসাধারণ যে বলেন, ‘যা হয় একটা কিছু করুন, আমরা আছি’ — এ মনোভাব থেকে দেশে কিছুই হতে পারে না। এরকম মনোভাব থেকে মাঝে মাঝে যে ধরনের লড়াইগুলো দেশে হচ্ছে তাই হয়। সেই লড়াই কি শুধু আজ হচ্ছে? ১৯১৯ সাল থেকে মজুররা মালিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে প্রাণ দিয়ে আসছে। কত লোক ফাঁসিকাঠে গেছে, পুলিশের বিরুদ্ধে কলকাতায় কত ‘ব্যারিকেড ফাইট’ হয়েছে, কত গণআন্দোলন হয়েছে, কতবার পুলিশ-মিলিটারি সেই গণআন্দোলনে কলকাতাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু তার ফল কী হয়েছে? দেশের মানুষের অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হয়েছে। এক পা-ও আমরা এগোতে পারিনি। আবার অনেকে আজ ভাবছেন, কিছুই হচ্ছে না। এই যে এত লড়াই হ’ল, ট্যাঙ্ক নামল, কলকাতা কতবার ব্ল্যাক আউট (যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপ অবস্থা) হ’ল, পুলিশের সঙ্গে কত বোমা-পাটকেল নিয়ে লড়াই হ’ল — সেই লড়াইয়ের পরেও কেন আবার আজ মানুষ ভাবছে, কিছুই হচ্ছে না, লড়াই হচ্ছে না। কারণ, এই লড়াইগুলোর চরিত্র সেই ‘স্পোরেডিক’ (ইতস্তত বিক্ষিপ্ত), ‘স্পন্টেনিয়াস’ (স্বতঃস্ফূর্ত) — যেটা মার খেতে খেতে মানুষের মধ্যে ফেটে পড়ে মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বুঝুক না বুঝুক হঠাৎ একসময় সে আন্দোলনে ফেটে পড়ে। কিন্তু যেহেতু সঠিক নেতৃত্ব নেই যেহেতু বোঝবার ধৈর্য নেই, সংগঠন নেই, সেহেতু আন্দোলনগুলোকে স্পন্টেনিটি থেকে কখনই মুক্ত করা যাচ্ছে না। এক একটা আন্দোলনের পর ফ্রাসট্রেশন মানুষকে ছেয়ে ফেলছে। অন্যদিকে যে দল সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে, আন্দোলনে সেই দলের নেতৃত্ব আজও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সেই কারণে সে ইচ্ছে করলেও আন্দোলনকে কন্ট্রোল করতে পারছে না, সঠিক

রাস্তায় পরিচালিত করতে পারছে না। যদি পারত তাহলে লড়াইয়ের কৌশল এবং মূল লক্ষ্য মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারত, মানুষকে ফ্রাসট্রেশন থেকে মুক্ত করতে পারত এবং জনতার নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ারগুলো ধীরে ধীরে গড়ে তুলে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারত। এইটা করতে গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী আন্দোলনে কখনও কখনও রিট্রিটও করত এবং এটা করত জনতাকে বুঝিয়েই যে রিট্রিট করার কেন দরকার এবং না করলে বিপ্লবের কী ক্ষতি হত। কারণ, মনে রাখা দরকার যে, বৃহত্তর আর একটা সংগ্রামে যাওয়ার জন্যই আন্দোলনের শক্তিকে অপচয় না করে কখনও কখনও এইভাবে রিট্রিট করা দরকার এবং রিট্রিটটাও একটা সংগ্রাম।

যেমন, মিলিটারিতে 'অ্যাড্ভান্সমেন্ট'টাও (এগোনো) লড়াই, রিট্রিটটাও লড়াই। দুটো 'আর্মি' যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ে তখন একপক্ষ আর একপক্ষকে সম্পূর্ণ পরাস্ত না করা পর্যন্ত শুধু কি একটানা এগোতেই থাকে? না, সে এগোয়, আবার দরকার মত পেছোয়, এগোনোটাও তার লড়াই পেছোনোটাও তার লড়াই। সে লড়াইয়ের কায়দাতেই এগোয়, লড়াইয়ের কায়দাতেই পেছোয়। আবার লড়াই বাধবার আগে যে 'কোল্ড ওয়ার' হয়, অর্থাৎ লড়াইয়ের পক্ষে একটা আবহাওয়া তৈরি করতে হয়, জনমত তৈরি করতে হয় সেটাও একটা লড়াই। এইটা না করে আসল লড়াই করা যায় না। কারণ লড়াইটা যারা মাঠে-ময়দানে করে তাদের খাদ্য জোগায়, রসদ জোগায়, গুলিবারুদ জোগায় দেশের মজুরশ্রেণী, দেশের মানুষ। কাজেই দেশের মানুষকে যদি যুদ্ধের পক্ষে টেনে আনা না যায় তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে যে সৈনিকরা তারা পাঁচদিনের বেশি যুদ্ধ করতে পারে না। তাই প্রত্যেক যুদ্ধবাজেরই যুদ্ধ করার আগে দরকার 'ওয়ার সাইকোসিস' (যুদ্ধোন্মাদনা) সৃষ্টি করা। যদি যুদ্ধবাজদের, প্রতিক্রিয়াবাদীদের এটা দরকার হয়, তাহলে বিপ্লবীদের দরকার হয় না? ধরুন, বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই চালাবার মত লক্ষ লক্ষ চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে একটা বিপ্লবী দল যদি সংগঠিত করে ফেলতেও পারে, তাহলেও বিপ্লবের সময়ে সেই সংখ্যাটা কত দাঁড়াতে পারে? দশ, পঁচিশ, কি পঞ্চাশ লক্ষ লোককে নিয়েই সেই লড়াইটা শুরু হবে — এই তো বাস্তব। কিন্তু সেই লড়াইয়ের পিছনে দেশের আশি কোটি লোকের মধ্যে যদি পঞ্চাশ কোটি লোকের একটা সাপোর্ট না থাকে, তারা যদি না মনে করে যে যারা লড়ছে তারা তাদের লোক, এই লড়াইতে সবরকম সাহায্য জুগিয়ে যাওয়া তাদের কাজ, তাহলে বিপ্লব হবে না। দেশের বেশিরভাগ মানুষ যদি গোটা লড়াইটাকে এইভাবে দেখে যে এটা তাদের লড়াই নয়, এটা অমুক পার্টির ব্যাপার, তাদের এত ঝঞ্ঝাটে যাবার দরকার নেই, তাহলে যে পঞ্চাশ লক্ষ লোককে লড়াই করবার জন্য তৈরি করা হ'ল তারা লড়াই করে এই পুঁজিবাদী

ব্যবস্থার গায়ে একটি আঁচড়ও দিতে পারবে না — দেওয়ার আগেই তারা শেষ হয়ে যাবে। তাহলে বিশ বছর পরিশ্রম করে যে পঞ্চাশ লক্ষ বিপ্লবী তৈরি করা হ'ল, বিপ্লবের পক্ষে জনমত তৈরি না করে যদি মূর্খের মতো একটা আচরণ করতে যাওয়া হয় তাহলে একটা দল বিপ্লবের নামে বিশ বছরের নিজের হাতে সৃষ্ট পরিশ্রমের ফলকে এক ধাক্কায় নষ্ট করে দেবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, লড়াইয়ের মধ্যে লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি বোঝা দরকার।

'রিকগ্‌নিশন অব নেসেসিটি' বলতে কী বোঝায়?

বিপ্লবীদের মনে রাখতে হবে যে, বিপ্লবীর সংগ্রাম সর্বত্র। তার 'এগ্‌জিস্‌টেন্স'টাই (অস্তিত্বটাই) সংগ্রাম। সে সবসময় একজন বিপ্লবী হিসাবে সচেতনভাবে অবস্থান করে। কী সেই সচেতনতা? না, সে এইটা বুঝতে পেরেছে যে, তার বিকাশ, তার মুক্তির প্রশ্নটি সমাজের প্রগতি এবং বিকাশের প্রশ্নের সাথে জড়িত। সমাজের প্রগতি ব্যাহত হলে, সমাজ পরিবেশে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তারও বিকাশ ব্যাহত হয়। তারও পরিবারে তার ছায়া পড়ে। গোটা সমাজকে বাদ দিয়ে সে একা একা মুক্তি অর্জন করতে পারে না। একা একা মুক্তি অর্জনের রাস্তা অধ্যাত্মবাদীদের, যারা সংগ্রামের ময়দানে এসেছে তাদের নয়, বিপ্লবীদের নয়। আর একটা কথাও এখানে বুঝতে হবে। তা হচ্ছে, আমরা যে বলি, সমাজের অগ্রগতির স্বার্থের সাথে প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের স্বার্থ, উন্নতির স্বার্থ, সবকিছুর স্বার্থ জড়িত — এই ধারণাটিও ভাসাভাসা — যদি না বুঝতে পারা যায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোন্ সেই শ্রেণী, যে শ্রেণী শোষিতশ্রেণীগুলির অগ্রণী বা নেতা শ্রেণী — যে শ্রেণীর মুক্তির স্বার্থের সঙ্গে, প্রগতি-উন্নতি ও স্বাধীনতার স্বার্থের সঙ্গে গোটা সমাজের প্রগতি, উৎপাদনের উন্নতি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও সংস্কৃতির প্রগতির স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইটা বুঝলেই বুঝতে পারা যাবে, যেহেতু সেই বিশেষ শ্রেণীর মুক্তির প্রশ্ন, স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং সেই শ্রেণীর সংগ্রাম ও নেতৃত্বের প্রশ্নের সঙ্গে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুক্তির প্রশ্ন জড়িত, সেই কারণেই যে শ্রেণীসংগ্রাম গোটা সমাজকে সেই বিশেষ শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে একজন বিপ্লবী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

এটাই হচ্ছে আজকের সমাজের যথার্থ 'রিকগ্‌নিশন অব নেসেসিটি' (প্রয়োজনের উপলব্ধি)। এই প্রয়োজনের স্বীকৃতি বলতে একজন ব্যক্তির নিজের খাওয়া-পরার, চাকরি-বাকরির বা তার নিজের একটা ঘর গোছানোর প্রয়োজন বোঝায় না। বিপ্লবীদের প্রয়োজনবোধ এটা নয়। প্রতিটি মানুষের সত্যিকারের যা প্রয়োজন, সমাজের যা যথার্থ প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রগতিশীল বিপ্লবীশ্রেণীর যা যথার্থ

প্রয়োজন — যে প্রয়োজন থেকে সামাজিক একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, বিপ্লবীর প্রয়োজনবোধ হচ্ছে তাই। যে মানুষ ব্যক্তিবাদ থেকে, কূপমণ্ডুকতা থেকে বা স্বার্থবাদ এবং প্রবৃত্তির তাড়না, যা তার নিজের মধ্যেই রয়েছে, তার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায় সে একা একা লড়ে এগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। কারণ আজকের শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীচিন্তার যে প্রভাব রয়েছে তার ফলেই, সমাজব্যবস্থার প্রভাবের ফলেই তার মধ্যে এগুলি দেখা দিচ্ছে। ফলে যে শ্রমিকশ্রেণী এইগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে সমস্ত সমাজকে মুক্ত করতে চাইছে, সেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে আজকে যদি গোটা সমাজের উৎপাদনের প্রগতির প্রশ্ন, বিজ্ঞানকে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্ন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পুঁজিবাদী শোষণের জুলুম ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্নও শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাহলে এই মুক্তির প্রয়োজন উপলব্ধিই হল ব্যক্তির মুক্তির প্রয়োজন উপলব্ধি। এই প্রয়োজন উপলব্ধির থেকেই সমাজে একজন মানুষ বিপ্লবী হচ্ছে।

তাহলে সমাজে একজন বিপ্লবীর অবস্থান কী? না, সমাজে সে এমন একটি চেতনসত্ত্বা হিসাবে অবস্থান করছে যে, সমস্ত সমাজ পরিবেশের মধ্যে, বস্তু পরিবেশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যথার্থ স্বরূপটি অনুধাবন করতে পেরেছে এবং সে ধরতে পেরেছে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কোন্ কোন্ দু'টি মূল বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রগতির গতি নির্ধারিত হচ্ছে। যে সময়ে প্রগতির গতি নির্ধারিত হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে গোটা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা, সেই সময়ে একজন ব্যক্তির উন্নতি, তার স্বাধীনতা এবং সত্যিকারের প্রয়োজনের চেতনা, মুক্তির প্রয়োজনের চেতনা ছিল সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার সমস্বার্থবোধ। তখন সেই স্বাধীনতার প্রয়োজনবোধই ছিল তার যথার্থ প্রয়োজনবোধের উপলব্ধি, তার যথার্থ সমাজচেতনার এবং শ্রেণীচেতনার প্রকাশ। আবার আজকের সমাজে একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর একদিকে শোষিতশ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতই হচ্ছে মূল সংঘাত বা আজকের সমাজের মূল দ্বন্দ্ব — যে দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিচেতনা, ব্যক্তিসত্তা আবর্তিত হচ্ছে। এই মূল সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় সর্বহারাশ্রেণীর গণতন্ত্র, উৎপাদন-শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-নৈতিকতা সমস্ত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া একাধিপত্যের জায়গায় সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই প্রগতির পথ নির্দেশিত হচ্ছে। এই অবস্থায় আজকের সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রয়োজনের উপলব্ধির সঙ্গে যখন একজন ব্যক্তির প্রয়োজনের উপলব্ধি একীভূত হয়েছে তখনই সে বিপ্লবী।

সুতরাং এই সমাজে একজন বিপ্লবী অবস্থান করছে মানেই হচ্ছে সে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবস্থান করছে। এই বিরোধ শুধুমাত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে নয় — ঘরে-বাইরে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায়, রুচিতে সর্বত্র এই বিরোধ। ফলে একজন বিপ্লবীর কাছে ভাললাগা বা রুচির ধারণা হচ্ছে তা-ই যা বিপ্লবের পরিপূরক, যা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের পরিপূরক, যা উৎপাদনকে, শিল্পকে, সাহিত্যকে, বিজ্ঞানকে বুর্জোয়া ‘প্রি-কন্‌সেপশন’ (পূর্বধারণা) থেকে মুক্ত করার পরিপূরক। একজন বিপ্লবীর ভাললাগা বা রুচির ধারণা — বুর্জোয়ার উপলব্ধি, তার সংস্কৃতি, তার সৌন্দর্যবোধ, তার পরিবারের ধারণা, তার ভালবাসার ধারণা, তার যৌন স্বাধীনতার ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই হ’ল বিপ্লবীর যথার্থ অবস্থান।

তাহলে বিপ্লবী এইভাবে অবস্থান করে। সে অবস্থানই করছে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে। এই সংগ্রামের পরিকল্পনার মধ্যে কতকগুলি রুটিন ওয়ার্ক আছে। সেই রুটিন ওয়ার্ক একমাত্র তারাই সহ্য করতে পারে যারা শ্রেণীসচেতন, যারা মূল লক্ষ্যটা ধরতে পেরেছে। এই মূল লক্ষ্যটাকে গড়ে তোলবার জন্যই দীর্ঘদিন ধরে একটা পরিকল্পনায় বিপ্লবীদের কাজ করতে হয়। এলোমেলোভাবে যদি বিপ্লবীরা কাজ করে তাহলে সুসংগঠিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তারা ভাঙতে পারবে না। আমরা শুধু তার পুলিশকে দেখছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই পুলিশই সব নয়। আক্রমণে শেষ মোকাবিলা করতে হবে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সব থেকে সুসংগঠিত রাষ্ট্রের আর্মি বা মিলিটারির সঙ্গে। সেই শেষ মোকাবিলার আগে প্রয়োজনীয় জনশক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী আন্দোলন চালাবার মত সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য বিপ্লবীদের লড়াই শুরু করতে হয় ঘরে-বাইরে, নিজের মধ্যে, আদর্শের ক্ষেত্রে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে, রুচির ক্ষেত্রে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সর্বত্র। তাই মাও সে-তুঙ-ও বলেছেন, যে কোন বিপ্লবের পরিপূরক সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব সেই বিপ্লবের আগে শুরু করতে হয়। এ কথার অর্থ হচ্ছে, প্রতিক্রিয়াবাদীরাই হোক্‌, আর প্রগতিশীল বা বিপ্লবীরাই হোক্‌ — একে অপরকে যখন ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইবে, সত্যিকারের ক্ষমতাচ্যুত করবার সেই লড়াইটি গড়ে উঠবার আগে দীর্ঘদিন ধরে আদর্শগত ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের প্রচার এবং কাজ করে যেতে হয়। এই কাজটি এড়িয়ে গিয়ে মূল লড়াইতে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর এই কাজটিই হচ্ছে খুব কঠিন। যখন কোন গরম বা ফিভার সৃষ্টি করার মত লড়াই নেই তখন দিনের পর দিন প্রবল নিষ্ঠা এবং জ্বলন্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে রুটিন ওয়ার্ক চালিয়ে যেতে পারা, সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য কষ্টসাধ্য সংগ্রামে নিযুক্ত থাকতে পারা একমাত্র

একজন প্রকৃত সচেতন বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব। আমি আগেই বলেছি, দীর্ঘদিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই বিপ্লবী সচেতনতা গড়ে তোলবার সংগ্রামে যারা আসেনি, দিনের পর দিন রুটিন ওয়ার্কের মত কঠিন সংগ্রাম করবার কোন ক্ষমতাই যাদের নেই, তারাও মাঠে-ময়দানে যখন লড়াইটা চলে তখন সে লড়াইতে কত সহজে এসে যায় — যাকেই আমরা ভুল করে একমাত্র স্ট্রাগল বলে মনে করি। আর প্রতিদিন রুটিন ওয়ার্ক চালিয়ে যাওয়াটা, আমরা মনে করি, স্ট্রাগল নয়। অথচ বিচার করলে দেখা যাবে, দীর্ঘদিন ধরে এই রুটিন ওয়ার্কের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন। এর জন্য চাই চরিত্রের বল, চাই আদর্শের নিষ্ঠা, চাই সমস্ত জিনিসটাকে সম্যক উপলব্ধি করার ক্ষমতা।

তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, রুটিন ওয়ার্কটা দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লব গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কাজ এবং এটাও স্ট্রাগলেরই একটা রূপ। ফলে পার্টির কাজ সম্পর্কে সঠিক সমালোচনা হবে এটা বিচার করে দেখা যে, রুটিন ওয়ার্কটা কেবলমাত্র কতকগুলো বাঁধাধরা ছকে হচ্ছে, নাকি তার মধ্যে প্রতিনিয়ত জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলবার একটা পরিকল্পনা আছে। জনগণের সঙ্গে সংযোগের ভিত্তিতে কাজ করার এই প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত কন্ট্রাডিকশন আছে, তার টারময়েল (তীব্র মানসিক আলোড়ন) আছে এবং বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিত্যনতুন প্রক্রিয়ায় তাকে গড়ে তোলবার জন্য আন্দোলন আছে। আন্দোলন বলতে শুধু বাইরের একটা স্লোগান দেওয়া, মিছিল, মিটিং, ব্যারিকেড করে লড়াই, পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি এবং ক্ষমতা দখল করা নয়। এগুলো সবই আন্দোলনের এক একটা রূপ — চেতনার স্তরভেদে, সংগঠনের স্তরভেদে রূপভেদ। চেতনার স্তর, সংগঠনের স্তর, গণসমাবেশের স্তর এবং আক্রমণের ধারা এবং রীতি এই কয়েকটা জিনিস মিলে এই লড়াইয়ের ঢংগুলো, ফর্মগুলো — অর্থাৎ কোন্‌টা কোন্ ফর্মের লড়াই, কোন্ সময়ে কোন্ লড়াইটা হবে তা পাল্‌টে যায়। আলোচনা করা, তর্কবিতর্ক করা, ডিবেট করা, লোককে বোঝানো, বিরুদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধে ফাইট করা, ইউনিয়ন গড়া, কলেজ ইউনিয়ন চালানো, রাজনৈতিক ক্লাস পরিচালনা করা, পোস্টারিং করা, ডোর-টু-ডোর অ্যাপ্রোচ করা, বিরুদ্ধ মতবাদকে পরাস্ত করে জনগণের মধ্যে বিপ্লবী মতবাদ সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে তোলার জন্য ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে পেইনস্টেকিং (কষ্টসাধ্য) আলোচনা চালিয়ে যাওয়া — এগুলো সবই সংগ্রামের বিভিন্ন বিচিত্রতর এবং জটিলতর রূপ। এই সংগ্রামে যে কর্মী নিয়োজিত সে কখনও আপন নিয়মে কাজ করে না। সে ‘কালেকটিভে’র (যৌথ নেতৃত্বের) প্রোগ্রাম অনুযায়ী খুশি মনে কালেক্‌টিভের সঙ্গে মিলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এই কাজটি করে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা মেলাতে হবে

ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় কাজ বড় কঠিন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ব্যক্তিসত্তাটাকে আমরা ফাইট করতে চাই, সেই ব্যক্তিসত্তাটির কারণেই দেখা যায় একজন ব্যক্তি যে খানিকটা ভাসভাসাভাবে হলেও বিপ্লব বোঝে এবং অনেক সময়ে লড়তে চায়, কিন্তু লড়তে চায় সে নিজের নিয়মে। একদিকে সে লড়তেও চায় বিপ্লবের জন্য, আর একদিকে সে তার স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ঝোঁকটিকেও বাদ দিতে পারে না। অথচ সে জানে না এই লড়াইয়ের সত্যিকারের প্রয়োজনবোধের উপলব্ধির সঙ্গে আরেকটি উপলব্ধিও জড়িয়ে আছে — সেটি হচ্ছে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতাকেও বর্জন করতে হবে। স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার লড়াইটা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে কখনই ঈপ্সিত ফল এনে দিতে পারে না। কারণ তা সমষ্টির পরিকল্পনাধীন নয়। তাই মার্কসবাদী বিপ্লবীদের সংগ্রামের অ্যাপ্রোচ বা দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে 'টু স্ট্রাগল বোথ ইন্‌ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড কালেক্‌টিভলি' (ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে সংগ্রাম করা)। কারণ একা লড়ে কেউ বিপ্লব করতে পারবে না। তাই কালেক্‌টিভলি কী করে লড়তে হয়, বিপ্লবীদের তা জানতে হবে, শিখতে হবে। একজনকে একা একটা জায়গায় সংগঠনের কাজ করতে দিলে যদি তার লড়াই করার একটা আকাঙ্ক্ষা এবং 'স্যাক্রিফাইস' (ত্যাগ স্বীকার) করবার একটু প্রেরণা থাকে তাহলেই দেখা যায় সাধারণ মানুষগুলিকে নিয়ে নিজের নেতৃত্বে সে খুব ভাল কাজ করে। কারণ তার নেতৃত্ব সেখানে 'আনডিস্‌পিউটেড' (অবিসংবাদিত), তার ব্যক্তিসত্তায় সেখানে বিশেষ ঘা লাগে না, তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কারোর টক্কর লাগে না, সে 'হিউমিলিয়েটেড' (অপমানিত) ফিল করে না, তার ইগোতে কোথাও আঘাত লাগে না। কিন্তু আর পাঁচটা কমরেড যারা 'প্যারালাল পার্সোনালিটি' (সমান্তরাল ব্যক্তিত্ব) তাদের সঙ্গে একটা পরিকল্পনায় মিলে একত্রে কাজ করতে গেলেই দেখা যায় পরস্পর ব্যক্তিসত্তায় টক্কর লাগছে — আর তেমন কাজ হচ্ছে না, নানা গণ্ডগোল হচ্ছে। ফলে সকলে মিলে একত্রে পরিকল্পনা নিজের মত হয় ভাল, যদি অপরের মত অনুযায়ীও পরিকল্পনাটি হয় সেই পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় এবং খুশিমনে কী করে কাজ করতে হয় সেটি শিখতে হয়। এবং সেটি শিখতে গেলে নিজের স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মনোভাব বিসর্জন দিতে হয় — না পারলে সেটি শেখা যায় না। এই স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মনোভাব বিসর্জন দিতে পারাটা শেখা যাবে কী করে? শিখতে গেলে একত্রে কাজ করতে করতে কালেক্‌টিভকে মেনে কাজ করার অভ্যাসটি 'ডেভেলাপ' করাতে হবে। আমি অনেক সময় শুনি, কোন কোন কমরেড এই বলে তর্ক করেন যে, কালেক্‌টিভ পদ্ধতিতে কাজ তাদের

একেবারেই ভাল লাগে না। তাদের শুধু কী করতে হবে বলে দিয়ে একা ছেড়ে দেওয়া হোক্। তারা একাই সেই কাজ করে দিয়ে আসবেন। কী অদ্ভুত কথা! যেন তারা এমন বিরাট ক্ষমতার অধিকারী যে একাই বিশ্বজয় করে ফেলবেন। একা কেউই বিশ্বজয় করতে পারবেন না। স্বয়ং ঈশ্বর পারেননি, অন্যরা আর কী পারবেন!

তাহলে মূল কথা হচ্ছে, প্রত্যেককে কালেক্‌টিভের মধ্যে থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। রুটিন ওয়ার্ক — যা বিপ্লবী সংগ্রামের একটা অপরিহার্য অঙ্গ তা বিপ্লবী কর্মীদের এই কালেক্‌টিভের মধ্যে থেকে কাজ করবার অভ্যাস শেখায়, ধৈর্য শেখায়। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিসত্তা, যে অহম্ প্রতিনিয়ত তাদের 'ডিসিভ' করে (ঠকায়), ভুলপথের নির্দেশ দেয় তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সাহায্য করে। প্রত্যেকের মধ্যে তার যে নিজস্ব বুদ্ধি-বিচার তা তাকে একটা জিনিস করতে বলে, অন্যদিকে তার ব্যক্তিসত্তা তাকে তা করতে আটকায়, তাকে অন্যদিকে নিতে চায়। এই হচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই যে প্রত্যেকের মধ্যে দু'টি জিনিসের লড়াই — এটাও আজকের সমাজের বুর্জোয়া এবং শ্রমিকের লড়াইয়ের প্রতিফলন। এই অবস্থায় হয় নিজের মতটাকে কালেকটিভের মতে পরিণত করতে হবে, না হয় কালেকটিভের মতটা নিজের মতের বিরুদ্ধে গেলেও সেই মতটাকেই খুশি মনে মেনে নিয়ে চলতে হবে। এ মানসিকতা যদি না থাকে তাহলে একত্রে চলতে চলতেই নিজের মনের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে, নিজের মধ্যে যে বুর্জোয়া সত্তা যেটা ব্যক্তিসত্তার রূপে, 'আলট্রা' (উগ্র) স্বাধীনতার রূপে, স্বাধীনচেতা মনোভাবের রূপে আত্মপ্রকাশ করছে তাকেই একজন লালনপালন করবে। শুধু তত্ত্ব করে মনে মনে ভেবে একজনের মধ্যে যে কুসংস্কার, ব্যক্তিসত্তা, ইন্‌ডিভিজুয়ালিটি বা অহম্ আছে তা দূর করা যায় না। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকের মধ্যে যে চেতনসত্ত্বাটি পারিপার্শ্বিকের সাথে সংঘাতের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে, আবার বিরাজও করছে সেই সংঘাতের মধ্যে — সেই সংঘাতের স্বরূপ নির্ধারণ করে যে সঠিক পথটি পাওয়া গেল সেই পথে যদি চেতনসত্ত্বাটি নিজের কর্মকে নিযুক্ত করতে পারে তবে সে যেমন বস্তুকেও প্রভাবিত করে, নিজেকেও উন্নততর করে। আর তা নাহলে সে অধঃপতিত হয়।

'ইগো' ও 'সুপারইগো'র শ্রেণীচরিত্র

আমরা জানি, যে কোন মানসিক ভাবনাধারণা — তা 'ইগো' হোক্, 'ইন্‌স্টিংক্ট' (সহজাত প্রবৃত্তি) হোক্ দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করে। এই ইগো বা ইন্‌স্টিংক্ট

সমাজপরিবেশ নিরপেক্ষভাবে এক থাকে না। একটি বিশেষ সমাজের মূল দ্বন্দ্ব সেই বিশেষ সমাজের ভাবনাধারণার কাঠামোটি গড়ে দেয়। সমস্ত মানসিক ভাবনাধারণাই 'স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন', অর্থাৎ ভাবগত উৎপাদন — সচেতন মনের ক্রিয়া। যখন সামন্তী সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবী পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বে 'সার্ফ'দের, ভূমিদাসদের লড়াইটা সমাজের মূল দ্বন্দ্ব ছিল, তখন সেই মূল দ্বন্দ্বের প্রতিঘাতে তখনকার ইগো, ইন্স্টিংক্ট, মানসিকতাগুলো একরকম প্রতিভাত হয়েছে। আবার আজকের সমাজে যে ইগো, ইন্স্টিংক্ট, মানসিকতাগুলো আছে, মূল কাঠামোতে তা সামন্তী সমাজের সঙ্গে একেবারে একরকম নয়। প্রবৃত্তিকে অনেকসময় 'ইম্‌মিউটেবল' বা পরিবর্তনাতীত মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। প্রবৃত্তি বলতে প্রবৃত্তির এক একটা 'গিভেন' (বিশেষ) 'ক্যাটিগরি' আছে, কাঠামো আছে। এক একটা 'মেটেরিয়াল কন্ডিশন' (বাস্তব অবস্থা) সেই বিশেষ কাঠামোটির পরিধিনির্দেশক কন্ডিশন।

যে কোন ভাবনাধারণা — অর্থাৎ যে কোন চিন্তা, ভাব, ধারণা, কল্পনা — সমস্ত কিছুই মানুষের মনে গড়ে উঠছে বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতের প্রতিফলনে। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে বিশ্লেষণ করবার, চিন্তা করবার যে ক্ষমতা রয়েছে — যে প্রক্রিয়াটি জন্তু-জানোয়ারের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে নেই, শুধু মানুষের মস্তিষ্কের গঠনে আছে, সেই প্রক্রিয়াটি থাকার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের মনন জগৎ গড়ে উঠেছে। বস্তুজগতের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারদেরও সংঘাত হচ্ছে, কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের গঠনে এই প্রক্রিয়াটি না থাকার ফলে তারা 'সাবজেক্ট টু ন্যাচারাল ল' অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূতই থেকে গেছে। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ও আচার আচরণই 'রিফ্লেক্স অ্যাকশন' (পরাবর্ত ক্রিয়া) — অর্থাৎ 'কন্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স' (শর্তাধীন পরাবর্ত) এবং 'আন্‌কন্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সে'র (শর্তহীন পরাবর্ত) দ্বারা পরিচালিত। তার দ্বারাই তারা সব কিছু করে। তাদের 'ইন্‌টেলিজেন্স' (বুদ্ধিশুদ্ধি) সম্পর্কে যাই বলা হোক্ তা কন্ডিশনড রিফ্লেক্সেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছাড়া কিছু নয়। মানুষের মধ্যে সেখান থেকে আরেকটা প্রক্রিয়া ফলো করে। মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে — যেটা 'সেন্‌সেশন টু মোটর অ্যাকশন'-এ (সংবেদন থেকে পেশী সঞ্চালন) এসে 'রিফ্লেক্স অ্যাকশনে'ই শেষ হয়ে যাচ্ছে না — আর একটা 'সিগ্‌ন্যাল' (সংকেত) দ্বারা, দ্বিতীয় সিগ্‌ন্যাল সিস্‌টেম দ্বারা একটা নতুন 'ট্র্যাক' সৃষ্টি হচ্ছে — সেই ট্র্যাকটি 'লিডিং টু পারসেপশন, কনসেপসন অ্যান্ড দেন টু ইমোশন' (গতিপথটি ভাব, উন্নততর ভাব ও তারপর আবেগের সৃষ্টি করে)। জন্তু-জানোয়ারের যেখানে শুধু 'ফিজিক্যাল ব্লাইন্ড ইমোশন' (অন্ধ শারীরিক ক্রিয়া) — অর্থাৎ 'ইমোশনাল নার্ভাস অ্যাক্‌টিভিটি ইজ দি ওন্‌লি পসিবল অ্যাকটিভিটি' (অন্ধ স্নায়ু ক্রিয়াই একমাত্র সম্ভাব্য ক্রিয়া), সেখানে

মানুষের ক্ষেত্রে এই অ্যাকটিভিটি আরও উচ্চস্তরে কাজ করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে, 'ফ্রম ব্লাইন্ড ইমোশন টু রিজ্নিং থ্রু প্রসেস অব ট্রান্শ্লেসন' (চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্ধ স্নায়ুক্রিয়া থেকে যুক্তিতে পৌঁছানো) — সেখান থেকে 'পার্সেপচুয়াল নলেজ', তার থেকে 'কন্সেপচুয়াল নলেজ' এবং শেষপর্যন্ত আবার একটা উন্নত ধরনের ইমোশন।

সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা দু'ধরনের ইমোশন দেখতে পাই। একটা হচ্ছে ব্লাইন্ড টাইপ অব ইমোশন — যেটা 'নট টিউন্ড অর গাইডেড্ বাই রিজন্ অর কন্সেপচুয়াল নলেজ' (যুক্তি বা উন্নততর ভাব ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত নয়)। এই ব্লাইন্ড ইমোশনও মানুষকে চালায়। এই ব্লাইন্ড ইমোশন হচ্ছে অন্ধের মতন। এখানে মানুষের আচরণ খানিকটা জানোয়ারের মতোই, অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, পরিবেশের দাস। এই ইমোশনাল মুভ্মেন্টটা মানুষকে হঠাৎ বড়ও করে দিতে পারে, মানুষকে একদম নিচেও নামিয়ে দিতে পারে। সুতরাং এই ইমোশন অন্ধ। এর ওপর নির্ভর করা চলে না। এই ব্লাইন্ড ইমোশন থেকে ট্রান্শ্লেসন-এর মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে যে পারসেপচুয়াল নলেজ গড়ে ওঠে সেও ভাসাভাসা জ্ঞান। তার দ্বারাও মানুষ এই 'ইমোশনাল কার্ভেচার'টিকে (অন্ধ স্নায়ুক্রিয়ার বিশেষ গতিকে) পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে পারে না। তার থেকে যে কন্সেপচুয়াল নলেজ, অর্থাৎ কংক্রিট নলেজ মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় যেটা 'গাইডেন্স প্রোভাইড' (পথ প্রদর্শনের) করার ক্ষমতা রাখে, সেই কংক্রিট নলেজ-ই ব্লাইন্ড ইমোশনকে 'প্যাটার্ন' করে (একটি আদলে গড়ে তোলে), 'টিউন' করে (একটি বিশেষ সুরে বেঁধে দেয়)। ফলে এর থেকে যে ইমোশন রিলিজড্ হয় সেটা বেস্ড অন নলেজ (জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে) — অর্থাৎ চেতনার ওপর, নলেজ-এর ওপর আবার ইমোশন। বিপ্লবীদের যে ইমোশন আমরা দেখতে পাই সেটা এই চেতনার ওপর ইমোশন। তাই একে রাশ টেনে ধরতেও তারা পারে। এই ইমোশন তাদের বিপথগামী করে দেয় না, তাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে না। যে আবেগ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তা হ'ল সেই প্রথম আবেগ যেটা ব্লাইন্ড ইমোশন। কিন্তু যে আবেগ বেস্ড অন নলেজ অ্যান্ড রিজন্ সেটা ব্লাইন্ডইমোশন-এর থেকেও আরও কার্যকরী, আরও 'ডিসিসিভ'।

স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদী সমাজেও মানুষের সমস্ত ভাবনাধারণা — তা ইগো হোক্, আর যাই হোক্ — পুঁজিবাদী সমাজের যে মূল দ্বন্দ্ব অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর সাথে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত শোষিত জনগণের যে দ্বন্দ্ব, সেই মূল দ্বন্দ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও আবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই তার ইগো বা অহম্-এর সাথে তার সুপার ইগো, অর্থাৎ চেতনসত্ত্বা বা বিবেকের প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত হচ্ছে। একজন বুর্জোয়ার মধ্যেও ইগো এবং সুপার ইগোর

দ্বন্দ্ব আছে। এই সমাজপরিবেশের যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তার মধ্যে রয়েছে সেটা হচ্ছে তার ইগো। আর পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থ সম্পর্কিত যে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ‘এগ্রিগেট ইন্টারেস্ট অব ক্যাপিটালিজম্’ তার মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে তার সুপার ইগো — যা তাকে ‘ন্যাশনালিস্ট’ ও ‘হিউম্যানিস্ট’ করে তুলছে। ফলে তার মধ্যে এই হচ্ছে ইগো এবং সুপার ইগোর সংঘাত। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি মালিকের মধ্যে একদিকে তার ব্যবসার প্রয়োজন অন্যদিকে তার মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের সামগ্রিক প্রয়োজনবোধ — এই হচ্ছে তার ইগো এবং তার সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব। আবার পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া এবং শ্রমিকের মূল দ্বন্দ্বের মধ্যে একজন শ্রমিক বাস করছে বলে যখন সে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় তখন তার সুপার ইগোর রূপ নেয় বিপ্লবী চেতনা। বুর্জোয়া সমাজে বাস করছে বলেই সমস্ত শ্রমিকের সুপার ইগো বিপ্লবী চেতনা নয় — যদিও ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব তার মধ্যেও আছে। যেমন একজন ভদ্রলোক যিনি বিপ্লবী হননি তাঁর মধ্যেও বিবেক এবং প্রবৃত্তির লড়াই আছে, ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব আছে, অর্থাৎ ভাল-মন্দ তিনিও বোঝেন। তাঁর মধ্যেও একটা মন একটা জিনিস করতে চায়, আরেকটা মনে বলে — এটা খারাপ, এটা করা উচিত নয়। এই যে তাঁর মন একটা কাজ করতে চাইছে, নানা প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা দিচ্ছে যেটা তাঁর বিবেক তাঁকে করতে নিষেধ করছে — সেটা আসছে তাঁর প্রবৃত্তি থেকে, তাঁর ইগো বা অহম্ থেকে। আরেকটা হচ্ছে তাঁর সামাজিক চেতনা, সে যেমন করে যতটুকু আয়ত্ত করেছে যেটা তাঁকে বলছে — না, এটা খারাপ, এটা করো না — সেটাই তার সুপার ইগো বা বিবেক।

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটি মানুষের সমাজচেতনার ক্যাটিগরিটাকে অ্যানালিসিস করলে দেখা যাবে, কারোর মধ্যে এটা পুরোপুরি বুর্জোয়া ভাবনাধারণা, কারোর মধ্যে প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভাবনাধারণা, আবার কারোর মধ্যে বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভাবনাধারণার একটা আধাখিচুড়ি হয়ে আছে — অর্থাৎ কিছুটা বুর্জোয়া ভাবনাধারণার প্রভাব, কিছুটা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভাবনাধারণার প্রভাব — এই দিয়ে তার বিবেকটির গঠন। যার মধ্যে এইভাবে কিছুটা বুর্জোয়া ভাবনাধারণার প্রভাব, কিছুটা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভাবনাধারণা মিশে আছে, দেখা যায়, কখনও তার বিবেক বলে বুর্জোয়ার পক্ষ নিতে, কখনও তার বিবেক বলে শ্রমিক আন্দোলন সমর্থন করতে। কিন্তু সবসময়ই প্রত্যেকের বিবেক তার ব্যক্তিস্বার্থ বা ইগোকে খারাপ কিছু না করতে নির্দেশ করছে। এইভাবে ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব প্রতিটি মানুষের মধ্যে সবসময়ই হচ্ছে এবং এটা চলতেই থাকবে। যতক্ষণ না উৎপাদনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সংঘর্ষ সেই সংঘর্ষের বীজ সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে

চলে যাচ্ছে ততক্ষণ 'ইন্ডিভিজুয়াল সাইকোলজি'র, অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়ালিটি বা ব্যক্তিসত্তার এই 'ফেনোমেনন' 'এলিমিনেটেড' হবে না। আজকের পুঁজিবাদী সমাজে সমস্ত মানুষেরই ইগো গড়ে উঠছে কমবেশি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রাধান্যে অথবা শ্রমিক ভাবাদর্শের প্রাধান্যে। ফিউডাল ভাবধারা যদি তার মধ্যে মিশ্রিত থেকেও থাকে তবুও তার মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারা প্রধান, কি শ্রমিকশ্রেণীর ভাবধারা প্রধান তা দিয়ে তার চরিত্র নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ 'ডমিনেন্ট' (প্রধান) চরিত্র দিয়েই তা নির্ধারিত করতে হবে। পুরোপুরি সামন্তী ভাবধারায় আজ আর কারোরই চলার উপায় নেই।

সুতরাং সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিবাদী প্রবণতা, অহম্ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য একজন ব্যক্তির যে সংগ্রাম তা যদি বৃহত্তর সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে উদ্দেশ্য যতই সৎ হোক না কেন তার পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তির সংগ্রামকে সবসময় সমষ্টির সংগ্রামের সাথে মেলাতে হবে। কিন্তু এই সমষ্টিগত সংগ্রামকেও সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং ভুলত্রুটি থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তা চালানো প্রয়োজন। তাই জনসাধারণের মধ্যে পড়ে থেকে দলের রুটিন ওয়ার্ক চালানোর মধ্যে কর্মীদের যে একটা ঢিলেঢালা গতানুগতিক মনোভাব আছে তাকে দূর করে কাজের গতিকে যেমন আপনাদের বাড়াতে হবে, তেমনি সাথে সাথে তা সুপরিকল্পিতভাবে করতে হবে। যদি দেখা যায়, কাজের গতি দ্রুত হচ্ছে কিন্তু তা পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে না তাহলে তাতে হবে না। হয়তো ছোটাছুটি করে আপনারা একটা কিছু করে ফেললেন, কিন্তু দেখা গেল সেই করার পেছনে কোন পরিকল্পনা নেই, আদর্শগত ভিত্তি নেই, তা সমষ্টিগত পরিকল্পনায় করা হয়নি তাহলে তা দাঁড়াবে না। তাতে অযথা সময়ের অপব্যবহার হবে। কাজেই আমার বক্তব্য এটা নয় যে, কাজের ক্ষেত্রে আপনারা লাফিয়ে লাফিয়ে কতটা এগিয়ে যেতে পারলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনারা হেঁটেই যাবেন বা সামর্থ্য অনুযায়ী দৌড়েই যাবেন, কিন্তু যাবেন পরিকল্পনার ভিত্তিতে, সুষ্ঠু নেতৃত্বের অধীনে। ব্যক্তিগত আচরণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার যে ঝোঁক প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে তাকে সমাজচেতনার দ্বারা প্যাটার্ন করে, টিউন করে আপনাদের চলতে হবে।

এইভাবে পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুষ্ঠু নেতৃত্বের অধীনে পার্টির কর্মসূচিগুলি যদি আপনারা রূপায়িত করতে থাকেন এবং সাথে সাথে পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে কোথায় কী ত্রুটি আছে সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করে কীভাবে তাকে আরও সুন্দর করা যায় সেই চেষ্টা করতে থাকেন তাহলে দ্রুত সংগঠনকে প্রয়োজন অনুযায়ী শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করাতে আপনারা সক্ষম হবেন। কিন্তু সমালোচনার ধারা যদি

আপনাদের এই হয় যে, আপনারা 'ত্রুটি আছে', 'কিছুই হচ্ছে না' শুধু এই বলতে থাকেন তাহলে সেটা হবে নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। এর অর্থ হচ্ছে আপনারা কিছু করবার জন্য সমালোচনা করছেন না। আপনারা যে কিছু করছেন না সেটা আড়াল করার জন্য সমালোচনা করছেন। আপনারা মনে রাখবেন, নিজের সমালোচনার চরিত্র কী তাও ধরবার কতকগুলো উপায় মার্কসবাদী বিজ্ঞান তুলে ধরেছে। যখন আপনাদের বক্তব্যের মধ্যে শুধু নেগেটিভ ক্রিটিসিজ্‌ম থাকে, বিক্ষোভ থাকে, বিক্ষোভই হচ্ছে যার আধার — অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দলকে কী বাদ গিয়ে কী গ্রহণ করতে হবে তা আপনারা বলেন না, শুধু এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে না, এটা কেন হবে, ওরকম করার মানে হয় না, এরকম করলে কী করে হবে — এইসব বলে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন তখন বুঝতে হবে এর অর্থ হচ্ছে, আপনারা যে কিছু করতে পারছেন না সেইটা যখন ধরা পড়ছে তখন আসলে অপরের দোষের মধ্যে তার কারণ খোঁজেন।

যাঁরা এভাবে চিন্তা করছেন তাঁদের ভাবতে হবে তাঁরা নিজেরা কী করেছেন বা পার্টির প্রোগ্রামে যদি কিছু ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে কী সেই ত্রুটি এবং কী সেই প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রাম তাঁদের ওখানে নেওয়া দরকার ছিল। এইটুকুই হবে তাঁদের বিচার্য বিষয়। তাঁদের অসন্তুষ্ট হওয়ার বা মন উৎক্ষিপ্ত হওয়ার কোন 'পয়েন্ট' এখানে নেই বা বিক্ষোভের কোন পয়েন্ট নেই। শুধু এইটুকু অতৃপ্তি থাকতে পারে যে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের কাজে সন্তুষ্ট নন। আর বাকি সব জিনিসটাই হচ্ছে তাঁদের অহম্ যেটা তাঁদের ঠকাচ্ছে — নিজেরা যে পারছেন না সেই দোষটাই হয় পার্টির পরিকল্পনা, নাহয় সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। হয়তো অনেক সময় এগুলোও 'ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট' হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে সেগুলো কংক্রিট পয়েন্ট হিসাবে আসবে। অর্থাৎ কংক্রিট্‌লি বলতে হবে, কী বিশেষ ধরনের প্ল্যান নেওয়া উচিত ছিল যেটা নেওয়া হয়নি, বা অমুক নেতা যে প্ল্যানটা দিয়েছিলেন সেটা ব্যর্থ এবং অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে এইভাবে হলে কাজগুলো হতে পারত। কিন্তু যাঁরা বিক্ষোভ প্রকাশ করেন, যাঁরা সমালোচনা করেন, যাঁরা 'রিমার্ক পাস' করেন বা যাঁরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তাঁরা কি এইভাবে কংক্রিট পয়েন্ট তুলে আলোচনা করেন ? করেন না। আবার দেখা যায় একদল কর্মী আছেন, তাঁরা যে এলাকায় কাজ করেন সেখানে যখন কাজে এগোতে পারেন না তখন মনে করেন ঐ জায়গাটাই হচ্ছে স্পেশ্যাল, একটু অন্যরকম, বিচিত্র অসুবিধার জায়গা। তাঁরা মনে করেন, ঐরকম জায়গা অন্য কোথাও নেই। ফলে তাঁরা বলতে থাকেন, এলাকার পরিবেশ ভয়ানক প্রতিকূল সেইজন্য তাঁরা কিছু করতে পারছেন না। অর্থাৎ তাঁরা পরিবেশের মধ্যে নিজেদের না করতে পারার কারণ খুঁজে বেড়ান। এর দ্বারা আসল কথাটা তাঁরা ধরবার চেষ্টা করেন না। এবং তাঁরা নিজেদের ঠকান। তাঁরা ধরবার চেষ্টা

করেন না তাঁদের কী করণীয় ছিল যা তাঁরা করেননি। সেইটিই যদি তাঁরা ধরতেন তাহলে তাঁরা দেখতেন, ঐসব হাজার অসুবিধার মধ্যেও তাঁদের অনেক কিছু করার ছিল এবং তাঁরা কিছু করতে পারতেন। ফলে প্রতিটি কর্মীর সবসময় এইভাবে আলোচনা করা উচিত। আগে নিজেদের দিক থেকে দেখা উচিত কী তাঁদের করণীয় ছিল যা তাঁরা করেননি এবং কোথায় তাঁদের ত্রুটি।

নেতাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কোন কর্মী একটা কাজ পারেনি। একজন নেতা সেক্ষেত্রে নিজের দিক থেকে প্রথম এই প্রশ্নটা শুরু করবেন যে, তিনি সেই কর্মীটির ক্ষেত্রে, তার ক্ষমতা যতটুকু আছে ততটুকুর মধ্যে যাতে সে পারে তা করাবার জন্য কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং সে ব্যাপারে কর্মীটিকে তিনি কী সাহায্য করেছেন। নেতার নিজের দিক থেকে দেখতে হবে — প্রথমত সেই সাহায্য করার দিকটা ঠিক আছে কিনা। তারপর দেখতে হবে, কর্মীটি তার কী কী সীমাবদ্ধতার জন্য কাজটা করতে পারেনি এবং সেই 'অবজেক্‌টিভ ডিফিকাল্‌টি'গুলি (বাস্তব অসুবিধাগুলি) কী, সেইগুলো সম্বন্ধে নেতা তাকে ঠিকমত বুঝিয়ে দেবেন। তারপরেও যদি দেখা যায় যে, কর্মীটির যা করার ছিল তা করেনি তখন তাকে সেইটা পয়েন্ট আউট করতে হবে। কিন্তু নেতারা সবসময় তা করেন না। প্রায়শই যে কর্মীটি পারেনি তাকে তৎক্ষণাৎ অপদার্থ ধরে নিয়ে তাকে চাপাচাপি করেন। কর্মীরা কাজ করতে না পারার জন্য যে দায়িত্বটা নেতাদের ওপর বর্তাচ্ছে সেই দায়দায়িত্ব এড়াবার ঝোঁকটি অজ্ঞাত সাইকোলজিতে নেতাদের এইভাবে ডিসিভ্‌ করে। একথার মানে এ নয় যে, নেতাদের দোষের জন্যই কর্মীরা পারছে না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, নেতাদের যদি দোষের দিক না থেকে থাকে তাহলে তাঁরা বিষয়টিকে সঠিকভাবে অ্যাপ্রোচ না করে কর্মীদের ওপর গোড়াতেই মারমুখী হয়ে ওঠেন কেন?

আর একটা কথাও নেতাদের এখানে মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, দলের সমস্ত কর্মী এবং সমর্থক এক স্তরের নয়। কাজ করতে না পারার ক্ষেত্রে কর্মীদের বিভিন্ন ধরন থাকে এবং সেইটা বুঝে নানান স্তরে তাদের 'ট্যাক্‌ল' করতে হয়। বিভিন্ন কর্মীর এই যে বিভিন্ন ধরন সেইটা না বিচার করে একইরকম ঢালাওভাবে, ঢালাও 'ফর্মূলা'য় সব কর্মীকে ট্যাক্‌ল করতে গেলে 'পারটিকুলারিটি অব কন্‌ট্রাডিকশন'-এর (বিশেষ দ্বন্দ্বের বিশেষ অবস্থা) তত্ত্বকেই অস্বীকার করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় একজন কর্মী সৎ হওয়া সত্ত্বেও 'জেনুইন' কতকগুলো 'কন্‌ফিউশন' বা দোষের জন্য — যেগুলি সম্পর্কে সে 'অ্যালার্ট' নয় বা 'অ্যালার্ট' হওয়া সত্ত্বেও 'বিইং ভিক্‌টিম অব সার্টেন হ্যাবিট্‌স্ অ্যান্ড ট্রেট্‌স' (কিছু ক্ষতিকারক অভ্যাস ও কর্মধারার শিকার হওয়ায়) অনেক সময় নিজেকে রক্ষা করতে পারে না বা চেষ্টা করেও সে পারছে না। সেক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়

পর্যন্ত সেই কর্মীটিকে সেইগুলো শোধরাবার জন্য নেতাদের বারবার ধৈর্যের সাথে চেষ্টা করা উচিত। যেখানে সে পারছে না — যেহেতু এটা জানাই আছে খানিকটা যে সে পারছে না — সেখানে তার ওপরে মারমুখী হওয়ার চেয়ে সহানুভূতির সাথে সাহায্য করাটাই হবে নেতাদের বড় কর্তব্য। আবার নেতাদের মনে রাখতে হবে, এই 'সিম্প্যাথেটিক্যাল ট্রিট্‌মেন্ট' এবং হেল্‌প্‌টা যেন পার্টি চিন্তা বা পদ্ধতি বহির্ভূত কোন একজন নেতার শুধুমাত্র ব্যক্তিচিন্তার ওপর ভিত্তি করে না হয়। সেই বিশেষ সমস্যাটা — তার রূপ বা চরিত্র অনুযায়ী 'স্টাডি সার্কেলে' এবং আর পাঁচজনের সামনেও আলোচনা করা যেতে পারে, আবার রূপ ভেদে সবার সামনে না হয়ে নেতাদের মধ্যে বা যাদের সামনে আলোচনা করা যায়, করা যেতে পারে। সব জিনিস সবার সামনে আলোচনা করা না যেতে পারে, কিন্তু পার্টির কারোর না কারোর সামনে আলোচনা করা অবশ্যই উচিত। এটা কেবলমাত্র একজন নেতার ব্যক্তি ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তি ট্যাক্‌লিং যেন কখনই না হয়। তিনি যেভাবে বিষয়টাকে ট্যাক্‌ল করছেন সেটা পার্টির তত্ত্ব বা পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া চাই — অর্থাৎ তিনি যে পদ্ধতিটি একজন কর্মীকে ট্যাক্‌ল করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করছেন সেটা পার্টির দ্বারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হওয়া চাই। আবার এটাও নিশ্চিতরূপে বুঝতে হবে যে, এই ট্যাক্‌লিং-এর মধ্যে খানিকটা ব্যক্তি মিশে থাকে, যেটা যিনি ট্যাক্‌ল করছেন তাঁর নিজস্ব। তাঁর দিক থেকে তিনি তাঁর মতন করে করছেন। কিন্তু কোন সমস্যাকে ট্যাক্‌ল করার ক্ষেত্রে ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনমতেই তা পার্টি তত্ত্ব বা উপলব্ধির সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত সেই নেতার কেবলমাত্র নিজস্ব ব্যক্তি চিন্তা বা পদ্ধতি হতে পারে না। এইভাবে ট্যাক্‌লিং-এর ফল যদি আপাতদৃষ্টিতে ভালও দেখা যায় তাহলেও তা করা চলবে না। কারণ ভাল ফল হওয়া মানেই শেষ পর্যন্ত ভাল ফল বর্তায় না। ভাল ফল বর্তাচ্ছে মনে করে যিনি এইভাবে সমস্যার সমাধান করে দেন, শেষপর্যন্ত তার বেশিরভাগ সময়ই কুফল বর্তে যায়। এই হচ্ছে দলের অভিজ্ঞতা।

যে কর্মীটিকে ট্যাক্‌ল করে দেওয়া হ'ল সে যদি খুব খুশি হয়েও যায় তাতেও খুব ভাল ট্যাক্‌লিং হয়েছে এটা সবসময় প্রমাণ হয় না। কারণ মানুষ বহু কারণে খুশি হয়। ধরা যাক, কোন লোক একটা কাজ ঠিক করেনি বা তার কোন একটা আচরণ ঠিক হয়নি। এখন কেউ যদি সেই লোকটিকে ট্যাক্‌লের নামে বক্তব্যের মধ্যে তার সেই বেঠিক কাজ বা আচরণকেই নানারকমভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'প্যাট্রনাইজ' (সমর্থন) করে যান, আর তার দ্বারা সেই লোকটি খুশি হয়ে চলে যায় তাহলে কি সমস্যা সমাধান হয়েছে বলা যাবে? সে খুশি হওয়াতে কী হবে? তার সর্বনাশ হবে। কাজেই অখুশি হলেই খারাপ ট্যাক্‌লিং হ'ল, আর খুশি হলেই ভাল ট্যাক্‌লিং হ'ল — এরকম নয় বিষয়টা। তবে ভাল ট্যাক্‌লিং — অর্থাৎ

শেষপর্যন্ত ট্যাক্‌লিং সার্থক হয়েছে এর একটা লক্ষণ হচ্ছে, যে গোড়ায় অখুশি হবে সে আলোচনার শেষে খুশি হয়ে উঠে যাবে। আলোচনার শুরুতে যদি দেখা যায় কেউ অখুশি বা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে বা বুঝতে চাইছে না — এর অর্থ হচ্ছে তার নিজস্ব অহমের সাথে পার্টির ধ্যানধারণা ও উপলব্ধির বিরোধ লাগছে। তারপরে যখন সে যুক্তির দ্বারা বিষয়টা সত্যি সত্যি বুঝতে পারে তখন সে খুশি হয়। আবার এরকমও দেখা যায় যে, অনেকে যুক্তিতে মেনে নেয় কিন্তু খুশি হয় না। এরকম হলে বুঝতে হবে, যিনি ট্যাক্‌ল করছেন তিনি খানিকটা সফল হয়েছেন কিন্তু পুরোপুরি সফল হননি। অর্থাৎ আলোচনার শেষে যার সাথে আলোচনা হচ্ছে তিনি বক্তব্যটা ঠিক বলে মেনে যান, কিন্তু মুখটা তার হাসিখুশিতে জ্বলজ্বল করে না — বিষাদাচ্ছন্ন এবং গম্ভীর হয়ে তিনি উঠে যান — তাহলে বুঝতে হবে যিনি ট্যাক্‌ল করছেন তিনি খানিকটা সাক্‌সেসফুল হয়েছেন, পুরোপুরি নয়। এগুলো হচ্ছে খুব 'পারফেক্‌শনে' (নির্ভুল) ট্যাক্‌ল করার 'মেথড' হিসাবে যে দিকটায় নেতাদের নজর রাখা প্রয়োজন তার কথা। নেতারা যদি মারমুখী না হয়ে যুক্তি দিয়ে কারোর বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে তিনি সেই কর্মীটির ভুল ধরতে পারবেন এবং ভুল ধরতে পারলে তা তাকে দেখাতে পারবেন। আর একটা কথা মনে রাখবেন, ভুল দেখাতে পারলে তা নেতাকেও ভুলের উর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটা কথা হচ্ছে, সংগ্রাম ব্যতিরেকে কোন জিনিসের অগ্রগতি হয় না। নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যদি চিন্তার সংঘর্ষ না থাকে তবে নেতাদেরও অগ্রগতি হয় না, কর্মীদেরও হয় না।

বর্তমান পরিস্থিতির আহ্বান

কমরেডস্‌, আজকের পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে একটু কঠিন মনে হলেও বিপ্লবীরা জানে এরকম হাজার বাধা-বিপত্তির মধ্যেই তাদের কাজ করে যেতে হয়। কিন্তু সকল বাধা-বিপত্তির সামনে সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন, সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব, আর কষ্টসাধ্য সংগ্রাম শেষপর্যন্ত বিপ্লবকে জয়যুক্ত করে। ইতিহাসের এইটাই শিক্ষা। এই শিক্ষা মনে রেখেই আপনাদের ধৈর্যের সাথে পরিকল্পনা করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কাজ করে যেতে হবে, নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করে করে ক্রমাগত নিজেদের কাজের পদ্ধতি উন্নত ও নিখুঁত করার চেষ্টা চালাতে হবে। পার্টির বিপ্লবী রাজনীতিকে আপনাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আয়ত্ত করতে হবে এমনভাবে, যাতে যে কোন পরিস্থিতিতেই আপনারা জনগণের কাছে সঠিকভাবে পার্টি লাইন উপস্থিত করতে পারেন, তার সঠিকতা নিঃসংশয়ে জনগণকে বোঝাতে পারেন এবং সুবিধাবাদী ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলো যারা আজও জনগণকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে জনগণের মধ্যে

বিপ্লবী দল সম্পর্কে আস্থা ও ভরসা দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে পারেন, এই সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলিই হচ্ছে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি। এবং আপনারা সকলেই জানেন যে, সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত না করে পুঁজিবাদকে খতম করা যায় না। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তেছে তা সম্পন্ন করার জন্য প্রথমত প্রয়োজন একটি সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন, দ্বিতীয়ত দরকার পরিস্থিতিকে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে যাবার মতো উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তি, তৃতীয়ত দরকার উন্নত সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতির আধারে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলিকে সংযোজিত করে সেই সংগ্রামগুলো জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটিগুলোর মধ্য দিয়ে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে এই গণকমিটিগুলো শেষপর্যন্ত জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারে। এইটা করার জন্য যত দ্রুত একদিকে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে থেকে সমস্ত অংশের মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আপনারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন এবং অন্যদিকে আদর্শগত ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে পারবেন তত দ্রুত এবং ততদূর পর্যন্ত আপনারা শ্রমিক-চাষী ও মেহনতি জনগণের চেতনার মানের উন্নতিতেও সাহায্য করতে পারবেন। এবং যত দ্রুত আপনারা এই দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারবেন বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণটিও তত কাছে এগিয়ে আসবে। আমি এই আশা নিয়েই আজ আমার বক্তব্য শেষ করছি যে, আপনারা এই চ্যালেঞ্জ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন এবং এই সংগ্রামে সকল শক্তি নিয়ে নিজেদের নিয়োজিত করবেন।